দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

মহিলা চিকিৎসকের নৃশংস হত্যা তৃণমূল সরকারের মুখোশ খুলে দিয়েছে— পৃঃ ১৫

দুর্নীতি চাপা দিতেই কি অভয়াকে প্রাণ দিতে হলো? — পৃঃ ৩৫

৭৭ বর্ষ, ৩ সংখ্যা।। ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।। ২৩ ভাদ্র, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

নৈরাজ্য থেকে মুক্তি চায় মানুষ

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ২৩ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

৯ সেপ্টেম্বর - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

‘বাবুরাম’ মনুষ্যত্ব লোপাট করতে ফোঁস আর হুমকি দিচ্ছে, যে সাপের চোখ কান নেই ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

ফোঁস করতে গিয়ে ফ্যাসাদে মনসা পিসি ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

সামাজিক দায় অনস্বীকার্য ◻ ড. পিঙ্কি আনন্দ ◻ ৮

আকবরের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা রাজস্থানের স্কুল পাঠ্যসূচিতে ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

মুঘলিস্তান বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের কী শিক্ষা দিল? ◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ১১

শাহবাগে গর্জন আমার মাটি আমার মা, বাংলাদেশ ছাড়বো না ◻ ১৩

মহিলা চিকিৎসকের নৃশংস হত্যা তৃণমূল সরকারের মুখোশ খুলে দিয়েছে ◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ১৫

দুর্নীতি নিমজ্জিত পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যক্ষেত্র কোথায় দাঁড়িয়ে ◻ সুদীপ্ত গুহ ◻ ১৭

‘ছুটিয়াছে অমোঘ নিয়তির টানে’ ◻ ড. পঙ্কজ কুমার রায় ◻ ২৩

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভক্তি প্রসারের পুরোধা শ্রীল প্রভুপাদ ◻ পিন্টু সান্যাল ◻ ৩১

দীর্ঘজীবী সাধক শ্রীশ্রী ত্রৈলঙ্গস্বামী ◻ দীপক খাঁ ◻ ৩৪

দুর্নীতি চাপা দিতেই কি অভয়াকে প্রাণ দিতে হলো? ◻ দেবজিৎ সরকার ◻ ৩৫

পশ্চিমবঙ্গে কি এবার রাষ্ট্রপতি শাসন? ◻ কানু রঞ্জন দেবনাথ ◻ ৩৮

সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য : স্বরূপ ও সমাধান ◻ ড. শতরূপা চট্টোপাধ্যায় ◻ ৪৩

বামপন্থী-সহ বিরোধীরা এনডিএ সরকার ফেলার নোংরা খেলা চালিয়েও সফল হবে না ◻ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ◻ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ :

◻ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৫-৩০ ◻ অন্যরকম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৪৯

প্রকাশিত হবে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

স্বস্তিকা
আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

ভারতীয় শ্রমদিবস : বিশ্বকর্মা পূজা

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশ্বকর্মা হলেন দেবশিল্পী। তিনি নির্মাণ কার্যাদিরও দেবতা। ভারতে আবহমানকাল থেকে নির্মাণশিল্পীরা বিশ্বকর্মার পূজা করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বকর্মা পূজার দিনই ভারতীয় শ্রমদিবস। দল-মত নির্বিশেষে সমস্ত শিল্পী এইদিন পূজায় মেতে ওঠেন।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়েই আলোকপাত করবেন নন্দলাল ভট্টাচার্য, শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী, কল্যাণ গৌতম, সুদীপ্ত গুহ প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নৈরাজ্যের অবসান ঘটুক

যে বঙ্গভূমি একদা সমগ্র ভারতকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিল, যে বঙ্গ ভারতবর্ষে নবজাগরণের জোয়ার আনিয়াছিল, সেই বঙ্গভূমিতে আজ দুঃশাসনের শাসন চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে আজ নৈরাজ্য বিরাজ করিতেছে। সোনার বঙ্গভূমিতে প্রথম নৈরাজ্যের আমদানি করিয়াছে বিগত শতাব্দীর ষাট-সত্তরের দশকে কমিউনিস্টরা। রাজ্যে ক্ষমতা দখল করিবার পূর্বেই বাম ও অতিবামেরা এই রাজ্যকে রক্তাক্ত করিয়াছে। ক্ষমতায় আসিবার পর বামেরা প্রশাসনযন্ত্রকে কাজে লাগাইয়া সমগ্র রাজ্যকে রক্তরঞ্জিত করিয়াছে। দুঃশাসনের শুরু তখন হইতেই। শ্রেণীশত্রু খতমের নামে হত্যার রাজনীতি রাজ্যবাসী দেখিয়াছে। প্রকাশ্য দিবালোকে সরকারি আধিকারিক হইতে শুরু করিয়া সন্ন্যাসী ও প্রতিবাদী মানুষকে তাহারা নির্বিচারে হত্যা করিয়াছে। সন্তানকে হত্যা করিয়া সেই রক্তমিশ্রিত অন্ন মাকে খাইতে বাধ্য করিয়াছে। দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর রাজ্যবাসী তাহাদের এইরূপ লাল সন্ত্রাস দেখিয়াছে। স্বাধীনতার পরে যে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষায়, শিল্পে, অর্থনীতিতে প্রথম স্থানে বিরাজ করিত, চৌত্রিশ বৎসরের দুঃশাসনে তাহারা তাহার অন্তর্জলি যাত্রা ঘটাইয়াছে। সেই নৈরাজ্য থেকে মুক্তি পাইবার আশায় রাজ্যবাসী তাহাদের বিতাড়িত করিয়া বর্তমান শাসকদলকে আনিয়াছে। কিন্তু অচিরেই রাজ্যবাসী দেখিল, বামেদের অপেক্ষা ইহারা শত সহস্র গুণে ভয়ংকর। বামেরা ধ্বংসের অবশিষ্ট যেটুকু রাখিয়া গিয়াছিল, ইহারা তাহাও নিঃশেষ করিয়াছে। শাসক হইয়াও তাহারা রাজ্যটিকে লুণ্ঠন করিয়াছে। সবক্ষেত্রে চুরি — চাকুরি চুরি, রেশন চুরি, খাদ্য চুরি, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা চুরি। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা তাই বোধহয় বর্তমান শাসনকে চোরেদের শাসন বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রীকে চোরেদের রানি বলিয়া সম্বোধন করিতেও শোনা যাইতেছে। চুরির দায়ে রাজ্যের শিক্ষাদপ্তর, খাদ্যদপ্তর জেলখানায় রহিয়াছে। স্বাস্থ্যদপ্তরও জেলে যাইবার পথে।

আশ্চর্যের বিষয় হইল, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা হইয়াও নারী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে তাহার বিন্দুমাত্র সদিচ্ছা নাই। রাজ্যের যত্রতত্র ঘটিত নারীনিগ্রহকে তিনি ছোটো ঘটনা বলিয়া দায় সারিয়া ফেলেন অথবা নির্যাতিতারই দোষ রহিয়াছে বলিয়া কটাক্ষ করেন। বর্তমান শাসনকালে নারী সুরক্ষার দিকটি কীরূপ উপেক্ষা করা হইয়াছে তাহা একটি সরকারি নথিতে চোখ রাখিলেই পরিষ্কার হইয়া যাইবে। ২০১৭ হইতে ২০২১, এই পাঁচ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে দেড় লক্ষ নারী নিখোঁজ হইয়াছে। ইহার সহিত আরও একহাজার নারী পাচার হইয়া গিয়াছে। ইহা সরকারি তথ্য। বেসরকারি হিসাব ইহার বহুগুণ। ইহা ব্যতীত শাসকদলের মদতপুষ্ট গুন্ডাদের দ্বারা কত নারীনিগ্রহ হইয়াছে তাহার হিসাব দলদাস পুলিশ প্রশাসনের নিকট নাই। হাড়হিম করা নারী নিগ্রহ সন্দেশখালিতে ঘটিয়াছে। একটি সন্দেশখালি প্রকাশ্যে আসিয়াছে, রাজ্যে যে আরও সন্দেশখালি নির্মাণ করিয়াছে শাসকদলের নেতা-গুণ্ডারা, তাহাও কান পাতিলেই শোনা যায়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নির্বিকার।

সম্প্রতি আরজি কর হাসপাতালে যে মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও হত্যার ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাও শাসকদলের অনুপ্রেরণায়। অপরাধীদের আড়াল করিবার জন্য চলিতেছে শাসন-প্রশাসনের আপ্রাণ চেষ্টা। মুখ্যমন্ত্রী মুখে বলিতেছেন অপরাধীর শাস্তি চাই, কিন্তু অপরাধীদের আড়াল করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া উকিল নিয়োগ করিয়াছেন। এই দ্বিচারিতা রাজ্যের মানুষ ধরিয়া ফেলিয়াছে। মানুষ বিচার চাইতে রাস্তায় নামিয়াছে। প্রতিদিন ছাত্র-যুবা, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ দাবি জানাইতেছেন—বিচার চাই, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই। আরজি কর কাণ্ডের তদন্তের ভার আদালতের নির্দেশে সিবিআইকে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু শাসকদলের মদতে তথ্যপ্রমাণ লোপাট করিবার ফলে তদন্তে বিলম্ব হইলেও নাটের গুরুকে গ্রেপ্তার করিয়াছে সিবিআই। রাজ্যবাসীর আশা, অভয়া নিশ্চয় সুবিচার পাইবেন। রাজ্য সরকারের মুখোশ খুলিয়া যাইবে। বড়ো কথা হইল, রাজ্যবাসীকে সজাগ থাকিতে হইবে। মানুষের মুখ বন্ধ করিতে রাজ্য সরকার দান, খয়রাতির রাজনীতি শুরু করিয়া থাকে। ইহাতে একশ্রেণীর মানুষ প্রভাবিত হইয়া থাকেন। তাহারা চোখ বন্ধ করিয়া এই দুঃশাসনকে সমর্থন করেন। আরজি করের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে মানুষের সংবিৎ ফিরিয়াছে। ইহার বহিঃপ্রকাশও দেখা যাইতেছে। বহু ক্লাব পূজার অনুদান প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, ভাতা গ্রহণকারীরাও প্রতিবাদে মুখর হইয়াছেন। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে, এই দুঃশাসনের, নৈরাজ্যের অবসান করিতে হইবে। তাহা না করিতে পারিলে বঙ্গ ও বাঙ্গালির কলঙ্ক কিছুতেই ঘুচিবে না।

সুভাষিতম্

সত্যম্ বদ। ধর্মম্ চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ।
আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ।। (তৈত্তরীয়োপনিষদ্)

সত্য বল। ধর্মাচরণ কর। স্বাধ্যায়ে অলসতা কর না। আচার্যের অভীষ্ট ধন আহরণ কর এবং প্রজাপালনের পরম্পরাকে ছেদন কর না।

'বাবুরাম' মনুষ্যত্ব লোপাট করতে ফোঁস আর হুমকি দিচ্ছে

যে সাপের চোখ কান নেই

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

সুকুমার রায়ের কবিতা ধার করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপক নাম দিলাম 'বাবুরাম সাপুড়ে'। পুরাণ, ইতিহাসে এই ধরনের রূপক রয়েছে। সুকুমার রায়ের সাপ আসলে সাপ নয়। ফোঁস বা ছোবল কোনোটাই পারে না। হারপেটোলজিস্টরা বলেন সাপের চোখ থাকলেও বহিঃকর্ণ নেই। উপরের চোয়ালের হাড়ের সঙ্গে যুক্ত স্টেপিস বা কলুমেলার সঙ্গে ককলিয়ার সংযোগে সাপেদের অন্তঃকর্ণ গঠিত, যার পাশাপাশি মুখের ভিতরে থাকা জ্যাকবসন অর্গানের সাহায্যে কম্পন বুঝে সে শত্রু চিহ্নিত করে।

তেরো বছর আগে এই রাজ্যে এক বিপরীত সাপের আমদানি হয়। এ রাজ্যের নতুন সাপ চক্রান্ত বোঝে। বাম ছুঁচো গিলে তার সৃষ্টি। তাই সাপ আর সাপুড়ে এক সঙ্গেই জন্মায়। এসব কবি ভাবেননি। তেরো বছর ধরে বাবুরাম রাজ্য চালাচ্ছে। ফাঁকতালে কয়েকটি ভোট জিতেছে। তাই সর্পকুল বুঝিয়েছে তিনি সব সমালোচনার ঊর্ধ্বে। তাতে সমর্পিত আমলা আর ভৃত্য কোতোয়াল রয়েছে। তারা সবাই মিলে ঝাঁপির মধ্যে কন্যা অভয়ার মর্মান্তিক মৃত্যুর তথ্য লোপাট করতে চায়। মনে হয় না সফল হবে। নিকৃষ্টরা চেষ্টার কসুর রাখছে না। সর্পকুলের কাজ তথ্য লোপাট আর মিথ্যাচারণ।

প্রাণ হারানো কন্যাকে সামনে রেখে 'বাবুরাম' প্রধানমন্ত্রীকে দু'টি অবান্তর পত্র লেখেন। প্রত্যক্ষ জবাব পাননি। দিল্লির অলিন্দে ভালোভাবে 'বাবুরামের' সর্প চরিত্র ফাঁস হয়েছে। তাই সাপ আর সাপুড়ে তাড়াতে দণ্ডের প্রয়োজন। প্রধান বিরোধীর তা সত্বর বোঝা দরকার। তেরো বছরে পশ্চিমবঙ্গ বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে। বিষ নামানোর রাস্তা হলো, মানুষকে বোঝাতে হবে বাবুরামের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। মনুষ্যত্ব লোপাটের খেলায় যারা মত্ত, মৃত্যদণ্ডই তাদের যোগ্য বিচার। কেবল পতাকা ধরে তাদের সরানো মুশকিল। সঙ্গে লাগবে বৃহত্তর সমাজের সমর্থন।

তেরো বছর আগে বাবুরাম ছিল মুখোশ। বাম রক্তবীজ উপড়ে ছিল রাজ্যের মানুষ। সেই সময় পুনরায় আগত। বাবুরাম-বিরোধীদের সময়োপযোগী হতে হবে। রাজনৈতিক পতাকা অন্যায় আর সুবিধাবাদের প্রতীক নয়, মানুষকে তা বোঝাতে হবে। কারণ রাজনৈতিক প্রতীক সর্বদাই অন্যায়ের উদাহরণ হিসেবে সামনে চলে আসে। ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার বদলে তা ছেড়ে দেওয়া অনেক কঠিন, মানুষকে তা বিশ্বাস করানোর মতো কোনো রাজনৈতিক দল এই মুহূর্তে এই দেশে নেই।

অভয়ার মৃতদেহ রাজনৈতিক পতাকায় মুড়ে যাক, পিতাসমান হয়ে কোনোভাবে তা চাইব না। তার বহ্নিমান আত্মাকে সুবিচার দিতেই বাবুরামের বিরুদ্ধে কলম ধরেছি। রাজনৈতিক লড়াই হলে বাবুরাম ফায়দা তুলবে। মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করবে। রাজনীতি সমাজের অংশ হলেও তা সমাজ নয়। তা বাড়িঘর আর রাস্তার মতো। কেবল ব্যবহারের যোগ্য। আর রয়েছে বাবুরামের মতো বিষাক্ত সাপেরা।

আমার কন্যার আত্মার সুবিচারের জন্য সমস্ত শ্রেণীর মানুষ রাস্তায় নেমেছেন। তাতে ভোট না দেওয়া সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ও রয়েছেন। ব্যতিক্রম শাসক বাবুরামের পালিত সাপেরা। কন্যা অভয়ার বিচার চাই বলে তারা এখন সর্পক্রন্দন জুড়েছেন। ছদ্মবেশীদের মানুষ চিনে ফেলেছেন। বাবুরামের পাশাপাশি জোরের সঙ্গেই দোষীদের বিরুদ্ধে ফাঁসি আর গুলির সাজার দাবি তার আশ্রিত সাপেরা করছেন। শুনেছি আরজি কর হাসপাতাল ভেঙে তথ্য লোপাটের জন্য চার সর্পনেতা ১৪ আগস্ট রাতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। আগামী বছর কলকাতা পুরভোটে এক সর্প নেতাকে প্যাঁচে ফেলে বদনাম করতে এক সর্প কাউন্সিলর এই কাজ করিয়ে ছিলেন। কোতোয়াল নাকি তাতে যুক্ত ছিল। ছোবলের ভয়ে রাত দুটোতে হাসপাতাল পাহারায় গিয়েছিল। বাবুরামের সর্পকুল হাসপাতাল আক্রমণ করে প্রমাণ করেছে সিবিআই ওঝার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সাপুড়ে বাবুরামেরও খোলস খুলে গিয়েছে। তাই দিশেহারা হয়ে তার সর্পকুলকে 'ফোঁস' করতে বা তারা যা ভালো বোঝে তাই করতে বলছে। মাত্রাজ্ঞান বাবুরামের কোনোদিন ছিল না। আর হবেও না। যে সর্পকুলে তাদের রাজনৈতিক জন্ম তারা এখন জলঢোঁড়া বা ঢ্যামনা সাপ হয়ে গিয়েছে। তবে বোধহীন বাম বিদেশিদের শায়েস্তা করতে এই মাত্রাছাড়া বাবুরামকে রাজ্যের মানুষ একদা সুযোগ করে দেয়। বুঝতে পারেনি যে সাপের সঙ্গে খালের জলে কুমিরও আসছে। পরে বোঝা গেল সাপ ও কুমির দু'টোই এসেছে। কেমন সাপ? তার চোখ নেই, কান নেই। আছে তার উৎপাত। আসলে তা বজ্জাত। দণ্ডের ব্যবহারেই বাবুরাম সাপুড়ে এবং তার পোষা সর্পকুল ধ্বংস হবে। তাই মানুষ বলছে, পতাকা ছেড়ে দণ্ড ধরুন। □

ফোঁস করতে গিয়ে ফ্যাসাদে মনসা পিসি

ফোঁসপিসিষু দিদি,

এখন আপনার যা সময় তাতে ফিসফিস করে কথা বলাই ঠিক। ঘরে বসে থাকাই ঠিক। পদত্যাগের মানুষ আপনি নন, তাই সে কথা বলতে চাইছি না, কিন্তু দিদি ফোঁস করতে যাবেন না এখন। আপনার দলের সবাই আমার মতো এটা জানে যে, এবারে যাবতীয় গোলমাল তৈরি হয়েছে আপনার একের পর এক ভুলভাল কথা আর কাজে। তাই চুপই থাকুন।

আপনি ফেসবুকে বিবৃতি দিয়ে জানালেন যে, আপনার বক্তব্যের 'অপব্যাখ্যা' করা হচ্ছে। আপনি আন্দোলনরত ডাক্তারদের কিছুই বলেননি। যা যা বলেছেন, সবটাই বিজেপির উদ্দেশে। কারণ কী? না, কেন্দ্রীয় সরকারের মদতে এ রাজ্যের গণতন্ত্রের ক্ষতি করে অরাজকতা সৃষ্টি করতে চায়। আচ্ছা দিদি, এবার কেন্দ্রীয় সরকার বা বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কোনও ভূমিকা দেখেছেন কি? রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল এত বড়ো একটা অপরাধের বিরুদ্ধে পথে নামবে না? আর আপনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে কী চাইছেন? দলের লুম্পেন কর্মীরা বিজেপি কর্মীদের উপরে ফোঁস করুক। আর আপনি জানেন তাঁরা ফোঁস করায় কতটা পারদর্শী। ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে তৃণমূলের ফোঁসে কত প্রাণ গিয়েছে তার হিসেব নিশ্চয়ই আপনার টেবিলে রাখা কোনও ফাইলে আছে।

আপনি 'ফোঁস' করার কথাও শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উদ্ধৃতিমাত্র বলে দাবি করেছেন। বলছেন যখন, আপনার কথা বিশ্বাস না করে উপায় নেই। তবে, যে কথা বলার পর দিনই তার তেরো হাত ব্যাখ্যা দিতে হয়, সে কথা বলার আদৌ কোনও প্রয়োজন ছিল কি না, আপনি ভেবে দেখতে পারেন। দিদি, একটা কথা মনে রাখবেন, মুখ থেকে বার হওয়া শব্দ, বন্দুকের গুলির মতোই। একবার বেরিয়ে গেলে তাকে আর ফিরিয়ে আনার উপায় থাকে না। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভা ছিল। সেখানেই আপনি যে 'ফোঁস' করার পরামর্শ দিলেন, 'বদলা নয়'-এর মন্ত্র বিস্মৃত হওয়ার কথা বললেন, সেই কথাগুলিকে যদি কোনও 'তাজা ছেলে' আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে? বদলের সেই বুলি কবেই-বা মনে রেখেছিল তারা? বরাবর বদলাই নিয়ে এসেছে।

১৪ আগস্ট রাতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের সময়ে যারা আরজি কর হাসপাতালে চড়াও হয়েছিল, তারা যদি ফের ফোঁস করে ডাক্তারদের একটু সমঝে দিতে চায়? বিজেপি কর্মীদের উপরে একই কাণ্ড করে? অতএব, কথাগুলো বলার আগে একটু ভেবে নিলে মন্দ হতো না দিদি?

অস্বীকার করা চলে না, রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তা যে কোনও প্রশাসকেরই রক্তচাপ বাড়িয়ে দিতে বাধ্য। আপনারও দিয়েছে। প্রাত্যহিক আন্দোলন, মিটিং-মিছিল এবং হাসপাতালে চিকিৎসকদের কর্মবিরতিতে আপনার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙারই কথা। কিন্তু দিদি, রাজ্যের মানুষের ধৈর্যের বাঁধ আগেই ভেঙেছে। মনে রাখবেন, অনেক রাগ এক সঙ্গে হয়ে রাত জাগছে আগুন রূপে।

মানুষ আপনাকে চেয়ার থেকে নামাতে চায়। সে দৃশ্য আমি দেখতে পারব না দিদি। এখনও সময় আছে, নিজের থেকে নেমে যাওয়ার। আরও কিছু ভুলভাল বলার আগে চূড়ান্ত ঠিক কাজটা করেই ফেলুন।

আমার তো মনে হয়, যে কথাগুলি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আপনার বলা উচিত ছিল, তা আপনি এখনও বলে উঠতে পারেননি। আসলে চাননি। রাজ্যের সর্বময় কর্ত্রী হিসেবে আপনার দায়িত্ব ছিল নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থনা করার। নিহত চিকিৎসকের পরিবারের কাছে, রাজ্যের চিকিৎসক সমাজের কাছে, রাজ্যের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছেও ক্ষমা চেয়ে পদত্যাগ করার। নিজের দলেরই কাউকে, প্রয়োজনে ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসানো। সন্দীপ ঘোষকে বাঁচানোর চেষ্টা না করা। যেটা আদৌ সম্ভব হয়নি। আপনার বলা উচিত ছিল, পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল ব্যর্থ। কিন্তু এমন ক্রান্তিকালেও আপনি রাজনীতির পরিধিকে অতিক্রম করতে পারলেন না, এর চেয়ে বড়ো ব্যর্থতা আর কী হতে পারে দিদি!

দিদি গো, এ সবই আড়াল থেকে করছেন রাজীব কুমার। সামনে রয়েছেন পুলিশের মুখপাত্র ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়। মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়। আমার না সাতের দশক মনে পড়ছে ইন্দিরা, সঞ্জয়, রাজীব নামগুলো শুনে। দিদি, জরুরি অবস্থার গন্ধ পাচ্ছি! মানুষ আপনাকে চেয়ার থেকে নামাতে চায়। সে দৃশ্য আমি দেখতে পারব না দিদি। এখনও সময় আছে, নিজের থেকে নেমে যাওয়ার। আরও কিছু ভুলভাল বলার আগে চূড়ান্ত ঠিক কাজটা করেই ফেলুন।

অতিথি কলম

ড. পিঙ্কি আনন্দ

সামাজিক দায় অনস্বীকার্য

কখন বলা যেতে পারে যে যথেষ্ট হয়েছে? কখন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেতে পারে? কখন বলা যাবে যে এই অসহনীয় পরিস্থিতি তার চরম সীমায় পৌঁছেছে? দিল্লির বুকে নির্ভয়াকাণ্ডের পর কি সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল? সন্দেশখালির ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর তা কি অসহ্য মনে হয়নি? আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সাম্প্রতিক ঘটনা সামনে আসার পর এবার কি বলা যেতে পারে যে যথেষ্ট হয়েছে? কেন এইভাবে ভারতীয় নারীরা অকথ্য, ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হবে? কী কারণে তারা সামাজিক সন্ত্রাসের বলি হবে? কেন বার বার তারা দুর্বৃত্তদের আক্রমণের সম্মুখীন হবে, কেন তাদের উপর সংঘটিত হবে জঘন্যতম অপরাধ? যাদের কারণে নারীরা আজ ভুক্তভোগী, সেই সন্ত্রাসীদের আড়াল করে সমাজের সর্বোচ্চ স্তরের প্রভাবশালীরা। জঘন্যতম অপরাধের সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের বর্বরোচিত কার্যকলাপ ধামাচাপা দেওয়ার পাশাপাশি ধর্ষিতা-মৃতার প্রতি তারা নামিয়ে আনে চরম অবিচার। একজন ডাক্তার ছাত্রী তাঁর কর্মস্থলে এরকম আক্রমণের শিকার হবেন— তা সকলের ধারণার বাইরে। এই সময়টা ছিল জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তাঁর কর্মদক্ষ হয়ে ওঠার সময়। এই বয়সে তিনি মেডিক্যাল শিক্ষা সমাপ্ত করে তাঁর কর্মজীবনে প্রবেশ করবেন, তাঁর পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করবেন এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু এই সবকিছুর বিপ্রতীপে, কর্মক্ষেত্রে কর্মরত থাকাকালীন তাঁকে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়।

'৮০-র দশকে একজন আইনজীবী হিসেবে দিল্লির আদালতগুলিতে যখন কাজ শুরু করি তখনকার স্মৃতি মনে পড়ে যায়। সেই সময় গ্রীষ্মকালে দিল্লিতে প্রখর তাপপ্রবাহের মধ্যে আমরা হাতে গোনা কয়েকজন মহিলা আইনজীবী আমাদের মক্কেল বা বিচারপ্রার্থীদের আইনি প্রতিকার এবং তাদের প্রাপ্য ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে কঠোর পরিশ্রম করে চলতাম। সেই সময় ক্রিমিনাল ল' বা ফৌজদারি আইনে বিশেষজ্ঞ একজন মহিলা আইনজীবীর সন্ধান পাওয়া ছিল এক বিরল ঘটনা। কয়েকজন বিশিষ্ট মহিলা আইনজীবীর তত্ত্বাবধানে, তাঁদের পরিচালনায় ও প্রশিক্ষণে আমরা যেন একটি সীমাবদ্ধ গণ্ডিকে অতিক্রমের চেষ্টা করতাম। পুলিশ, অপরাধী, বিচারপ্রার্থীদের পরিবার-পরিজন, আইনজীবী-সহ অসংখ্য লোকজনের মাঝে আমরা কয়েক জন মহিলা আইনজীবী প্রতিদিন আদালতে প্রবেশ করতাম। আদালতে এই লোকগুলি রোজ আমাদের ঘিরে থাকলেও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের জন্য আমরা যা করে চলেছি তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আদালতে আইনি লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী, বিচারপ্রার্থী মহিলারা যে ধরনের বিচার প্রক্রিয়ার সম্মুখীন হয়ে থাকেন, এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁরা যে অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করেন কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার ছাত্রীর ধর্ষণ ও হত্যার মামলাটি সেই বিষয়টিকেই যেন পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়। যদিও আগামীদিনে এই মামলার আরও অনেক পথ চলা বাকি।

কর্মস্থলে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য নিরাপদ কাজের পরিবেশ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইনি ও প্রশাসনিক সংস্কারের প্রয়োজনীতার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে উদ্ভূত সমস্যাগুলি।

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ধর্ষণ ও খুনের মর্মান্তিক ঘটনাটিতে রাজ্য সরকারি ক্ষমতাকেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগের আঙ্গুল উঠেছে। অপরাধমূলক ঘটনাবলীর দায় ঝেড়ে ফেলে এই প্রশাসনিক ক্ষমতাকেন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে প্রশ্রয় দিয়ে চলে জঘন্য, অপরাধমূলক চিন্তাভাবনাকে। তাদের তরফে বৈধতা পেয়ে অপরাধমূলক ঘটনাপ্রবাহ হয়ে ওঠে নিয়ন্ত্রণহীন এবং এই ঘটনাগুলি সমাজের বুকে স্থায়িত্ব লাভ করে। নাগরিকদের সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে তাদের নেওয়া শপথের সম্পূর্ণ বিপরীতে কাজ করে চলা বিকৃত-মস্তিষ্কের প্রশাসনিক যন্ত্র এই বল্গাহীন অপরাধের পিছনে থাকা মূল-চালিকাশক্তি। অপরাধস্থলে ভাঙচুরের ঘটনাটি প্রশাসনিক ব্যর্থতার পরিচায়ক। এই ঘটনা হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঘাটতি, অসঙ্গতি-সহ পুলিশের নানা অপকর্মকে তুলে ধরে। ভাঙচুর চলাকালীন পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার ছবি সত্যিই হতাশাজনক। মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত দ্ব্যর্থহীনভাবে কলকাতা পুলিশের তরফে চালিত তদন্ত প্রক্রিয়াকে নিন্দা করেছে। গোটা তদন্ত প্রক্রিয়াটি আইনানুগ হয়নি বলে তাদের পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। গত ২০ আগস্ট, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দায়ের করা মামলার শুনানিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আরজি কর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় পুলিশের তরফে ঘোরতর গাফিলতি ও কর্তব্যে অবহেলার বিষয়টি উল্লেখ করে সুপ্রিম কোর্ট।

এফআইআর দায়ের করতে পুলিশের

মাত্রাতিরিক্ত বিলম্ব হলো এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের প্রথম ও প্রধান পর্যবেক্ষণ। এফআইআর রুজু করার ক্ষেত্রে পুলিশের এই মাত্রাতিরিক্ত দেরির তীব্র নিন্দা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। দ্বিতীয়ত, মৃতার অভিভাবকদের তাঁদের কন্যার মৃতদেহ দেখতে দিতে বেশ কয়েক ঘণ্টার বিলম্বের ঘটনায় আদালত উষ্মা প্রকাশ করেছে। নির্যাতিতা ও মৃতার নাম-পরিচয় ও ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টিতে রাজ্য সরকারকে তীব্রভাবে তিরস্কার করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এই ঘটনায় নির্যাতিতার গোপনীয়তা ও সামাজিক মর্যাদা সংক্রান্ত মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে জানিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে নাগরিকদের গোপনীয়তা এবং সামাজিক সম্মান সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারের বিষয়টি ভারতীয় সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। এর আগে নিপুণ সাক্সেনা বনাম ভারত সরকারের মামলায় এই বিষয়টি বিশদে উল্লেখ করে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের শিকার ব্যক্তিদের গোপনীয়তার অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে এই মামলায় তাদের রায়ের মাধ্যমে একটি নির্দেশিকা জারি করে সুপ্রিম কোর্ট। সমাজে অবস্থানরত মানুষ যারা ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের শিকার তাঁদের কলঙ্কিত হওয়া রুখতে, যে ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার তাঁরা হয়েছেন, সেই পরিস্থিতি থেকে তাঁদের বের করে আনা-সহ নানাবিধ বিষয়ে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ হিসেবে এই রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

তৃতীয়ত, হাসপাতালে ভাঙচুর আটকাতে রাজ্য প্রশাসনের শোচনীয় ব্যর্থতা হতাশাজনক বলে জানায় সুপ্রিম কোর্ট। ঘটনাটি রাজ্যের প্রশাসনিক অক্ষমতা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিকে প্রকট করে বলে জানিয়ে সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়টিকে 'সিস্টেমিক ফেলিয়োর অফ ল' অ্যান্ড অর্ডার' বলে উল্লেখ করে। চতুর্থত, এই ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা (আনন্যাচারাল ডেথ কেস) রুজু করার আগেই মৃতদেহের ময়না তদন্ত বা পোস্টমর্টেম করা হয়। পঞ্চমত, এফআইআর দায়ের হওয়ার আগেই মৃতদেহটিকে দাহ করে ফেলা হয়। এছাড়াও, স্বাস্থ্যশিক্ষা ও চিকিৎসা পরিষেবা সংক্রান্ত একটি প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বন্দোবস্তের অভাবের বিষয়টিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট।

এই পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সমস্যাগুলির মোকাবিলায়, সারা দেশে স্বাস্থ্যশিক্ষা ও চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্তদের জন্য বিস্তারিত আকারে একটি সুরক্ষা বিধি (কম্প্রিহেনসিভ সেফটি প্রোটোকল) তৈরির ব্যাপারে জাতীয় স্তরে একটি টাস্ক ফোর্স গঠনের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে সুপ্রিম কোর্টের তরফে চিকিৎসা পেশার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত নিরাপত্তা সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের রূপরেখা নির্দেশিত হয়েছে। এই মামলার তদন্তে কতখানি অগ্রগতি হলো--- রাজ্য সরকার ও সিবিআইকে সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট ২২ আগস্টের মধ্যে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। ২২ আগস্ট এই মামলা পুনরায় শুনবে বলেও জানায় সর্বোচ্চ আদালত।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার মহিলারা : বিগত বহু বছর ধরেই চিকিৎসা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা নানা হিংসা ও সন্ত্রাসের শিকার হয়ে চলেছেন। সম্প্রতি, তাদের ওপর আক্রমণের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি রীতিমতো উদ্বেগজনক। এই সমস্যার নেপথ্যে থাকা কারণগুলিকে উপেক্ষা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। পরিকাঠামোর অভাব, অপর্যাপ্ত কর্মী, প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবার দুর্বিষহ অবস্থা এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী বলে উল্লেখ করেছেন চিকিৎসকেরা। চিকিৎসা পরিষেবা দানের সঙ্গে যুক্ত মহিলারা প্রতিদিন যেভাবে আক্রমণের নিশানা হয়ে উঠছেন তা বর্তমানে এইসব কিছুর থেকেও বেশি চিন্তাজনক বিষয়।

স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত মহিলা ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা বর্তমানে নানা বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন। এই পেশায় যুক্ত থাকার কারণে তাঁদের কর্মজীবন রীতিমতো ঝুঁকিপূর্ণ। পুরুষতান্ত্রিকতার দ্বারা চালিত চিন্তাধারা এবং নারীবিদ্বেষী, জঘন্য মনোভাবের কারণে পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে আরও বিষাক্ত। এই মহিলারা রোগীর আত্মীয়-সহ তাঁদের সহকর্মী ও ঊর্ধ্বতনদের থেকে নানারকম উৎপীড়ন, এমনকী যৌন-নির্যাতনের শিকার হন। যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর নিরাপদ হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে, সেখানে এই ভয়াবহতা, মহিলাদের উপর এই নৃশংসতা একটি নিদারুণ সত্য! অরুণা শানবাগ যে বীভৎস আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিলেন তা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মহিলাদের নিশানা করে সংঘটিত অপরাধগুলির মধ্যে অন্যতম। মহিলা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা নির্যাতনের শিকার হওয়ার কারণে গোটা সমাজে এই অপরাধী, নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, আক্রোশ ধূমায়িত হয়ে উঠলেও প্রশ্ন হলো--- শাসনতন্ত্রের ব্যর্থতা বা সিস্টেমিক ফেলিয়োরের এই মূল সমস্যাকে ভুলে থাকা যাবে আর কতদিন? এই সমস্যাকে উপেক্ষা করা, এর সমাধান না খোঁজার প্রবণতা আর কতদিন?

এই সমস্যাগুলি নিরসনে ভারতে সদ্য বলবৎ হয়েছে বিএনএস বা ভারতীয় ন্যায় সংহিতা। এই ভারতীয় আইনের বিভিন্ন ধারা-উপধারায় রয়েছে সমস্যাগুলির সমাধান। এর পাশাপাশি রয়েছে 'দ্য সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অফ উইমেন অ্যাট ওয়ার্কপ্লেস (প্রিভেনশন, প্রোহিবিশন অ্যান্ড রিড্রেসাল) অ্যাক্ট, ২০১৩', 'দ্য ক্লিনিকাল এস্টাব্লিশমেন্টস্ অ্যাক্ট, ২০১০'-এর মতো নানা আইন। তার সঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্তদের সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন রাজ্যের আইনও রয়েছে। এত কিছু সত্ত্বেও, বাস্তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এইসব আইন-কানুনের প্রয়োগ অতি-বিরল। আইন থাকলেও সমাজে তার কোনো প্রয়োগ প্রায় নেই। প্রয়োগ হলেও মামলার বিচার এবং সাজা ঘোষণার হার (প্রসিকিউশন রেট) খুবই কম। স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের সুরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি সুরক্ষা বিধি এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে নিয়মাবলীর অনুপস্থিতির কারণে সৃষ্টি হয়েছে আইনের ফাঁক। এই ফাঁকটি থেকে যাওয়ার কারণে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে নানা সমস্যা। কর্মস্থলে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য নিরাপদ কাজের পরিবেশ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইনি ও প্রশাসনিক সংস্কারের প্রয়োজনীতার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে উদ্ভূত সমস্যাগুলি।

(লেখিকা ভারতের প্রাক্তন অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল)

আকবরের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা রাজস্থানের স্কুল পাঠ্যসূচিতে

মুঘল বাদশা আকবরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলবার জন্য রাজপুতদের বীরত্বের গৌরবগাথা ভারতীয়দের খুব ভালো করেই জানা। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাদশা আকবর মুঘল সাম্রাজ্যকে রাজপুতনায় প্রসারিত করেছিলেন। তিনি চিতোর দুর্গ অবরোধ করেছিলেন এবং ১৫৬৮ সালে মেওয়ার রাজ্যকে নিজের অধীনে নিয়ে আসেন। তিনি রনথোম্ভরও অধিগ্রহণ করেছিলেন এবং একই বছরে সুরজন হাদার বাহিনীকে পরাস্ত করেন। রাজপুত শাসকরা যখন মধ্যযুগীয় সময়ে মুসলমান আক্রমণকারীদের কাছে হেরে যান, তখন মহিলারা তাদের পবিত্রতা ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্য আগুনে ঝাঁপ দিয়ে জহর ব্রত পালন করতেন।

সব মিলিয়ে আকবর বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি কিছু যুদ্ধে জয়লাভ করলেও রাজপুতদের অত সহজে বশে আনা যাবে না। তাই তিনি রণকৌশলেরও পরিবর্তন ঘটালেন। তিনি রাজপুত শাসকদের আস্থা অর্জনের জন্য বৈবাহিক সম্পর্কেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি নিজেই রাজপুত রাজকন্যা যোধাবাঈকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি বিপুল সংখ্যক রাজপুত রাজপুরুষকেও উচ্চপদ দান করেছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন, যেমন মান সিংহ ছিলেন তাঁর নবরত্নসভার অন্যতম সদস্য। তবে রাজপুতরা স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় জাত, কয়েকজন রাজপুত শাসক আকবরের আধিপত্য মেনে নিতে মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। এরকম দুজন শাসক ছিলেন মেওয়ারের উদয় সিংহ এবং মেরওয়ারের চন্দ্রসেন রাঠোর। তাঁরা আকবরের আধিপত্যকে মেনে নেনইনি, বরং তাঁর সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এই যুদ্ধ উদয় সিংহের উত্তরসূরি রাণা প্রতাপও অবিরাম যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। তাঁর সেনাবাহিনী হলদিঘাটের যুদ্ধে আকবরের সেনাদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হয়, সেখানে তিনি আহত হলেও পরাজয় স্বীকার করেননি। তার পর থেকে তিনি বারো বছর ধরে রাজপুতদের ঐক্যবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেন এবং মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, রাজপুতদের এই গৌরবগাথা ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। তার পরিবর্তে আকবরকে সেখানে মহান করে দেখানো হয়, তাঁকে 'মহামতি' আখ্যা দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে অনৈতিহাসিক অনেক কিছু স্কুল পাঠ্য বইতে জায়গা পেয়েছে। এই অনৈতিহাসিক যাবতীয় তথ্যকে ইতিহাস শিক্ষার পাঠক্রম থেকে দূর করে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য যাতে করে মানুষ নিজের পূর্বজদের পরাক্রমের কাহিনি জানতে পারে, সেব্যাপারে উদ্যোগী হলো রাজস্থান সরকার। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী মদন দিলওয়ার গত ১ সেপ্টেম্বর আঠাশতম রাজ্যস্তরীয় ভামা শাহ সম্মান সমারোহ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় তিনি ঘোষণা করেছেন, যে এবার থেকে স্কুলে মুঘল বাদশা আকবরকে একজন মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে আর পড়ানো হবে না।

তিনি ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে আকবরের তীব্র সমালোচনাও করেন। তিনি বলেন, এই মুঘল শাসকদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে যাতে কেউ আর প্রশংসা করতে না পারেন সেটা দেখা দরকার। তিনি খেদ প্রকাশ করে বলেন, মহারাণা প্রতাপ যিনি মেওয়ারের মর্যাদা রক্ষার জন্য সব কিছু ত্যাগ করেছেন তিনি কিন্তু মহান হিসেবে মর্যাদা পেলেন না।

প্রসঙ্গত, গত জানুয়ারি মাসে মদন দিলওয়ার মন্তব্য করেছিলেন, আধুনিক পরিভাষায় বলতে গেলে, মুঘল বাদশা আকবর নিতান্তই ছিলেন একজন ধর্ষক। তখনই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে তাদের যেন মহান ব্যক্তি হিসেবে আকবরকে তুলে ধরা না হয়।

স্বাভাবিকভাবেই এই পদক্ষেপ নিতে গেলে পাঠ্যপুস্তকে কিছু পরিবর্তন করার প্রয়োজন হবে। কিন্তু তাঁর মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ইতিহাসের পাঠ্যসূচিতে হাত দিতে গেলে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলবেন না? দিলওয়ার গত ৩০ জানুয়ারি স্পষ্টভাষায় জানিয়েছিলেন, রাজ্যের সিলেবাসে কোনও বদল আনার কথা তিনি বলেননি। তবে কোনও ব্যক্তি যদি সম্মান পাওয়ার যোগ্য না হন তবে পাঠ্যপুস্তকে তাকে সম্মান দেখানোর ব্যাপারে কোনো আপোশ তিনি করবেন না।

তাঁর বক্তব্য ছিল, কিছু বইতে সাভারকরকে দেশপ্রেমিক হিসেবে উল্লেখ করা হয় না। অথচ আকবরকে মহান হিসেবে দেখানো হয়। শিবাজীকে 'পাহাড়ি ইঁদুর' বলে আখ্যা দেওয়া হয়। আর মহারাণা প্রতাপের ভূমিকা আকবরের ক্ষমতায় ঢাকা পড়ে যায়। এটা করা যাবে না। এটার পর্যালোচনা দরকার।

মুঘলিস্তান বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের কী শিক্ষা দিল ?

পোটলা-পুঁটলি বেঁধে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে আজকের বাংলাদেশি হিন্দুদের মতো দৌড়ে পালাতে হবে। সেই অপেক্ষায় বুঝি প্রহর গুণছে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু!

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

অনেকে নিশ্চয়ই 'সাধনা ঔষধালয়- ঢাকা'র নাম শুনে থাকবেন? যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল ১৯১৪ সালে অবিভক্ত বঙ্গে। প্রতিষ্ঠাতা শ্রী যোগেশচন্দ্র ঘোষ, অবিভক্ত বঙ্গের প্রথম আয়ুর্বেদিক ঔষধ প্রস্তুতকারক। পুরনো ঢাকার দুই একর জমির ওপর কোম্পানির সদরদপ্তর। কলকাতা সহ বঙ্গ জুড়ে ছিল ১০০-রও বেশি শাখা। ১৯৭১ সালে এত বড়ো কোম্পানির মালিকের কী হাল হয়েছিল জানেন? খানসেনা-জামাত- রাজাকাররা মিলে কুকুরের মতো গুলি করে মেরেছে তাঁকে। তারপর যোগেশচন্দ্র ঘোষের বিশাল ব্যবসা একটি ইতিহাস। নিশ্চয়ই প্রশান্ত শূরকেও অনেকের মনে আছে? কমরেড প্রশান্ত শূর, যিনি একসময় জ্যোতি বসুর মন্ত্রীসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেছিলেন? তার বাড়ি ছিল বাংলাদেশের নোয়াখালি। কমরেড শূরের পিতা ছিলেন নোয়াখালির বিখ্যাত উকিল, রায় সাহেব নগেন্দ্র কুমার শূর। দেশভাগের সময় বিপদের আঁচ পেয়ে তিনি তাঁর স্ত্রী-পুত্র, পরিবারকে ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর মুক্তিযুদ্ধের একরাতে তাঁর প্রাসাদোপম বাড়ি ঘিরে ফেলেছিল গোলাম সারোয়ারের বাহিনী। তারা নগেন্দ্র শূরকে দিয়ে বাড়ির উঠোনে কোদাল দিয়ে খুঁড়িয়েছিল পাঁচ বাই দু'ফুটের একটি গর্ত। তারপর তাঁকে সেই গর্তেই জ্যান্ত কবর দিয়েছে। আর তাঁর গুণধর পুত্র প্রশান্ত শূর পশ্চিবঙ্গে এসে বাকি জীবন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির দুই কুসুমের গল্প শুনিয়েছিলেন নির্বোধ বাঙ্গালিকে। ভেবে দেখুন তো, এই ২০২৪-এ বাংলাদেশের ছাত্র অভ্যুত্থানে হিন্দুর ওপর ঘটে চলা অত্যাচারের ঘটনা প্রবাহ ১৯৭১ সালের সেই স্মৃতিকে মনে করিয়ে দিচ্ছে কিনা?

এই দু'টি ঘটনা কেন বললাম জানেন? আপনার যতই সম্পত্তি থাক, যতই অর্থ থাক, যতই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থাক, দেশ যদি একবার জেহাদিদের হাতে চলে যায়, আপনার সব কিছু মিথ্যা হয়ে যায়। এ তো গেল আজ থেকে ৫২ বছর আগেকার কথা। সেদিন না হয় খানসেনারা হিন্দুদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল। কিন্তু আজ? আজ তো সেই দেশে খানসেনারা নেই? সেদেশে তো হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই বাংলাদেশি? তাহলে বেছে বেছে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করছে কারা? আজ বাংলাদেশে যারা মারছে আর যারা মরছে তারা উভয়েই বাঙ্গালি, তবে এমন ঘটছে কেন? আসলে কারণটা ধর্মের। সালটি ১৯৪৭, ১৯৭১ বা ২০২৪ যাই হোক, আপনি সেকুলার হন বা হিন্দুত্ববাদী, বাংলাদেশে বাস করা সব হিন্দুর একই নিয়তি।

পাকিস্তানের প্রবক্তা কবি ইকবাল 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা' নামে একটি গান লিখে আমাদের বড়ো সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে। গানের একটি কলি হলো--- ''মজহব নেহি শিখাতা, আপস মে বৈর রাখনা''- অর্থাৎ উপাসনা পদ্ধতি কখনো শত্রুতা শেখায় না। এই গান শুনতে শুনতে দেশ তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেল। পাকিস্তানে ২১ শতাংশ হিন্দু ১ শতাংশ হয়ে গেল, বাংলাদেশের ২৭ শতাংশ ৭ শতাংশ হয়ে গেল, কাশ্মীরে ২০ শতাংশ আজ প্রায় শেষ। আর পশ্চিমবঙ্গে ৮৫ শতাংশ আজ ৬৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে; তবু আমরা সেই গান আজও গেয়ে চলেছি। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে, গলায় তুলসীর মালা নিয়ে দুই কুসুমের গান গেয়ে বাঁচা যাবে না। যদি মরার জন্য সবাই এক হই তবে কেউ মরবে না, আর যদি বাঁচার জন্য আলাদা হয়ে পালাতে হয় তবে কেউ বাঁচবে না। তাই আজ তাঁরা ৭ শতাংশ এক হয়ে পথে নেমেছে। কিন্তু এপারের হিন্দুরা? নাকি আজও আমরা বাংলাদেশের মতো ৭ শতাংশ হওয়ার অপেক্ষায়!

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন তাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীকে চেয়ার থেকে টেনে নামিয়েছে, দেশ থেকে তাড়িয়েছে— এটা তাদের অধিকার। দেশের ক্ষমতা পরিবর্তনের অধিকার দেশের নাগরিকদের থাকতেই পারে। কিন্তু সেই আন্দোলন কেন হিন্দু নিধনে পর্যবসিত হবে? কেন মিছিলে স্লোগান উঠবে 'ভারত যাদের মামা বাড়ি, বাংলা ছাড়ো তাড়াতাড়ি।' কেন হিন্দুর বাড়ি পুড়বে, কেন হিন্দু পুড়ে মরবে, কেন মা-বোন ধর্ষিতা হবে? আসল উদ্দেশ্য অবশিষ্ট ৭ শতাংশকে ধীরে ধীরে জিরো পার্সেন্টে নামিয়ে আনা।

যারা কুমিল্লায় 'বীরচন্দ্র গণপাঠাগার' পোড়ালো, এদের গুরুরাই তো একসময় নালন্দা, তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী পুড়িয়েছে। আজ এরা প্রমাণ রাখলো জাতটা হাজার বছরেও সভ্য হয়নি। বাংলাদেশের প্রখ্যাত লেখক, চিন্তাবিদ হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন, ''মুসলমানকে বিশ্ববিদ্যালয়ে মানায় না, মানায় মাদ্রাসায়। যেখানে দেড় হাজার বছর ধরে সবকিছু মুখস্থ করে ফেললেও জ্ঞানের 'জ'ও জন্মে না।'' আমরা এর আগে বহু আন্দোলন দেখেছি। কিন্তু কোনোদিন দেখিনি ছাত্র আন্দোলনের নামে প্রধানমন্ত্রীর আবাস থেকে চেয়ার, টেবিল, ফ্যান, বেসিন, পায়খানার প্যান, হাঁস, মুরগি, ছাগল, এমনকী মহিলা প্রধানমন্ত্রীর ব্যবহৃত সায়া, ব্লাউজ, অন্তর্বাস সহযোগে মিছিল করতে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত রচয়িতা রবি ঠাকুরের মূর্তিটাকেও তারা আস্ত রাখেনি। টুকরো টুকরো করে ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা নিশ্চয়ই রবি ঠাকুরের জাত খুঁজে পেয়েছেন। রবিঠাকুর হিন্দু, তাই তাঁর মূর্তি ভাঙার পরও তাঁরা চুপ। এমনকী অমর্ত্য সেনের নামটা যে রবীন্দ্রনাথ রেখেছিলেন সেই অমর্ত্যও মুখে কুলুপ এঁটেছেন। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে রবীন্দ্রমূর্তি ভাঙার পরেও শান্তিনিকেতন চুপ, জোড়াসাঁকো চুপ, সুশীল সমাজ চুপ, পাড়ায় পাড়ায় রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করা প্রতিষ্ঠানগুলো চুপ। রবীন্দ্রনাথ বোধহয় সেই কারণেই ১৯৩৩ সালের ১৬ই অক্টোবর হেমন্তী

ফঃ ২

বালা দেবীকে চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘‘প্রতিদিন নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা মুসলমান ও খ্রিস্টান হতে চলেছে। কিন্তু ভাটপাড়ার চৈতন্য নেই। একদা ওই তর্করত্নদের প্রপৌত্রীমণ্ডলীকে মুসলমান যখন জোর করে কলেমা পড়াবে তখন পরিতাপ করার সময় থাকবে না। ’’

বাংলাদেশের একজন সাংবাদিক সেই দেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসকে প্রশ্ন করেছিলেন, কোটা নিয়ে ছাত্রদের দাবি পূরণ হয়ে গেছে, দেশের প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করে দেশ ছেড়েছেন, এর পরেও কেন সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হচ্ছে? ইউনুস উত্তর দিয়েছেন, ‘‘বাংলাদেশের মানুষ নতুন করে স্বাধীন হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এখন তাদের মনে উত্তেজনা একটু বেশি। দেশের মানুষ এই জয়কে সেলিব্রেট করছে। ওদের খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না।’’

বাঃ, নোবেল লরিয়েট, বাঃ! স্বাধীনতার সেলিব্রেশন হিন্দু মেরে, ধর্ষণ করে, মন্দির ভেঙে, হিন্দু তাড়িয়ে? দু'দিন আগে ভারত এবং ভারতের সেভেন সিস্টার্স রাজ্যগুলিকে ভারত থেকে আলাদা করার হুমকিও দিয়েছিলেন এই নোবেল জয়ী। ইনিই খুনি হুজি-জামাত-আনসারউল্লাহ জঙ্গিদের জেলমুক্তির পরোক্ষ সমর্থক।

আমরা যারা বাংলা-বাঙ্গালি, বাঙ্গালির অস্মিতা, ‘জয় বাংলা’ বলে গদ গদ চিত্তে এক হাত জিভ বের করে ফেলি তারা ভাবুন, বাংলা ভাষায় কথা বললেই কি কেউ বাঙ্গালি হয়ে যায়? যারা জলকে পানি বলে, নিমন্ত্রণকে দাওয়াত বলে, জলখাবারকে নাস্তা বলে, স্নানকে গোসল বলে, বাবাকে আব্বা বলে, বউদিকে ভাবি বলে, মাকে আম্মা বলে, বোনকে আপা বলে, মাসিকে খালা বলে, পিসিকে ফুফি বলে, কাকাকে চাচা বলে, দাদুকে নানা বলে তারা কি বাঙ্গালি? এগুলি কি বাংলা শব্দ? বাংলা অভিধানে এগুলো আছে? না বন্ধু, বাঙ্গালি হতে গেলে বাংলা ভাষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতি -মহাপুরুষ এদের শ্রদ্ধা করতে হয়। শ্রীচৈতন্যদেব, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলকে নতমস্তকে প্রণাম করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের মূর্তি যারা ভাঙে, তারা কখনো বাঙ্গালি হতে পারে না। যারা বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত রচয়িতার মূর্তি ভেঙেছে তারা কস্মিনকালেও বাঙালি নয়। তারা আরবীয় বদরক্তের উত্তরাধিকারী।

বাংলাদেশে এত কিছু হওয়ার পরেও কেউ কি সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে এই বর্বরতার নিন্দা করতে দেখেছেন? অথবা সমাজবাদী পার্টি, জনতা দল প্রভৃতি তথাকথিত সেকুলার দলগুলিকে? যে কংগ্রেস ক'মাস আগে এআইসিসি-র স্পেশাল মিটিং ডেকে প্যালেস্তাইনে মানবতা হত্যার বিরুদ্ধে লিখিত প্রস্তাব পাশ করিয়েছিল, তারা কি ঘরের পাশে আত্মীয়দের ওপর ঘটে চলা এই নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু বললেন? এই রাজ্যের শাসকদল টিএমসিও কি এই নারকীয় ধ্বংসকাণ্ডের জন্য দু'চার ফোঁটা চোখের জল ফেললো? এমনকী এপারের সনাতনী ধর্মীয় সংগঠন, মঠ-মিশনগুলিও স্পিকটি নট। ব্যতিক্রম শুধু ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ।

গত ৬ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট কমিটি একটি বিবৃতি জারি করেছে। তারা লিখেছে –‘‘ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনের চেতনা ও ঐতিহ্য বজায় রাখতে হবে। ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ব্যবস্থা নিক।’’ স্বাক্ষর করেছেন কমরেড বিমান বসু। বাঃ, কমরেড, বাঃ! হিন্দুদের ওপর এত জঘন্য অত্যাচার, খুন, ধর্ষণ, মন্দির ভাঙা— এসবকেই আপনারা মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলনের চেতনা ঐতিহ্যের মধ্যে রেখে দিলেন? বিবৃতিতে হিন্দু শব্দটি একটিবারের জন্য উল্লেখ করলেন না? একদা কাঁটাতারের বেড়া টপকে ভিটেমাটি ছেড়ে এপারে আসা বিমানবাবু একবারও মনে রাখলেন না যে এই দুর্দিনে তার ওপারে রয়ে যাওয়া আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবরা কেমন আছে? ডিগবাজি খেয়ে এপারে এসে, এপার বাঙ্গলার হিন্দুদের সম্প্রীতির পাঠ পড়াচ্ছেন তিনি। ওনাদের এক কমরেড মামণি বলেছেন, ‘‘ দেশের স্মৃতি এখনো মনে আছে। দাদু বলতেন রিফিউজি ক্যাম্পে যখন ছিলাম তখন কোনো হিন্দু সাহায্য করেনি।’’ মামণিকে দাদু এত কথা বলেছেন, শুধু বলেননি কাদের জন্য দেশ ছাড়তে হয়েছিল? এখনও কি বুঝতে পারছেন না কমরেড, আপনার বাপ-ঠাকুরদারা কেন চলে এসেছিলে পূর্ববঙ্গ থেকে? এখনও না বুঝলে যান, বাংলাদেশে গিয়ে জামাত শিবিরকে বুঝিয়ে আসুন, লড়াইটা জাতের নয়, ভাতের।

রাহুল আনন্দ, বাংলাদেশের ‘জলের গান’ দলের স্রষ্টা, সেখানকার সেকুলার কুলের মধ্যমণি, ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধে হামাসের সমর্থক, যিনি একসময় কাশ্মীরের জঙ্গিদের স্বাধীনতা সংগ্রামী আখ্যা দিয়েছিলেন এবং জামাতের এই ধ্বংসাত্মক আন্দোলনকে ছাত্র আন্দোলন বলেও ব্যাখ্যা করেছিলেন, এই দাঙ্গায় তার বাড়িও পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে জেহাদিরা। তারা বুঝিয়ে দিয়েছে— তুমি যাই করো দিনের শেষে আমরা মুসলমান আর তুমি কাফের হিন্দু। এখন বাংলাদেশে চলছে হিন্দুমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার তোড়জোড়। বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখন হিন্দুদের চাপ দিয়ে পদত্যাগ করানো হচ্ছে। গত ১৯ আগস্ট থেকে এখনো পর্যন্ত জামাতিরা বুয়েটের উপাচার্য সহ প্রায় শতাধিক হিন্দু শিক্ষক, অধ্যাপক, সরকারি কর্মীকে জোর করে পদত্যাগপত্রে সই করিয়ে নিয়েছে। ঢাকার স্বনামধন্য হোলি ফ্যামিলি রেড ক্রস ক্রিসেন্ট সোসাইটির সোনালী রানী দাস থেকে শুরু করে কুমিল্লার দিদার মডেল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাদেবচন্দ্র দে সকলেই নাকি স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন। টার্গেট ২৬ লক্ষ হিন্দুর চাকুরি কেড়ে নেওয়া। আন্দোলনের লক্ষ্য পালটায়নি, প্রকৃতি পালটেছে মাত্র। হিন্দুকে শুধু হাতে নয়, ভাতে মারার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। চারদিন আগে ‘টাইমস অফ ইন্ডিয়া’ একটি খবর ছেপেছে। এখন জামাতের নতুন স্লোগান হলো— ‘হয় প্রোটেকশন মানি দাও, নয় বাংলাদেশ ছাড়ো।’ প্রত্যেক হিন্দুর বাড়ি নাকি চিহ্নিত করা হয়েছে। আর ধরে ধরে ফোন করা হচ্ছে। সরাসরি বলা হচ্ছে ৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে কিনতে হবে নিরাপত্তা। নয়তো দেশ ছাড়ো, নয় মরো”। বাংলাদেশ হলো এ যুগের মুঘলিস্তান। তাই কাফেরদের জন্য চালু হয়েছে জিজিয়া কর।

জওহরলাল নেহরু ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির অনুমোদন দিয়েছিলেন। আর আজ ৭৭ বছর পর ভারতের পূর্বাঞ্চলে আরও একটি পাকিস্তানের জন্ম হলো। আগামীদিনে ভারতকে হয়তো নেহরুর সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সম্পূর্ণ বাংলাদেশ আজ ভয়ংকর উগ্র মোল্লাবাদের কবলে। যার আঁচ আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গেও পড়তে চলেছে। কী ভাবছেন? আপনি ওদের সমর্থন করেছেন, তাই আপনাকে ওরা ছেড়ে দেবে? না ছাড়বে না। যারা রবি ঠাকুরকে ছাড়েনি, তারা আপনাকে ছাড়বে? অপর্ণা, অমর্ত্যরা আপনাকে মানবতার পাঠ শেখাবেন, রাজনীতির কারবারিরা ভোটব্যাংকের অঙ্ক গুনবেন, তবু আমাদের চোখ খুলবে না। আর বিশ-পঁচিশ বছর পর হয়তো আপনাকে, আমাকে নিজেদের ঘরবাড়ি, কর্মস্থল সবকিছু ছেড়ে একবস্ত্রে পালাতে হবে অন্য কোথাও? বাঙ্গালি হিন্দুর সামনে আসছে বিভীষিকার রাত। তখন পোটলা-পুঁটলি বেঁধে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে আজকের বাংলাদেশি হিন্দুদের মতো দৌড়ে পালাতে হবে।

সেই অপেক্ষায় বুঝি প্রহর গুণছে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু! □

শাহবাগে গর্জন
আমার মাটি আমার মা, বাংলাদেশ ছাড়বো না

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ ‘‘এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ, দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ।’’ সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার এই দুই চরণ দিয়ে শুরু করার পর মনের ভেতর গর্জে উঠলো এক অবিস্মরণীয় স্লোগান, ‘আমার মাটি আমার মা, বাংলাদেশ ছাড়বো না।’ কোনো আন্দোলনে এই স্লোগান যখন মুখ্য হয়ে ওঠে, তখন বোঝা যায়, হৃদয়ে কতখানি ক্ষত তৈরি হলে উত্তাল, স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র-জনতার সমুদ্র বজ্রকণ্ঠে উত্তোলিত হাতে এই স্লোগান দেয়। ছড়িয়ে পড়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, ঢেউয়ের মতো।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এক পর্যায়ে ছাত্র-জনতার এক দফার আন্দোলনে পরিণত হলে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতন ঘটে, তিনি দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেন। সঙ্গে ছিলেন ছোটো বোন শেখ রেহানা। সরকার পতনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল আগের দিনই, যখন কার্ফু (সান্ধ্যআইন) ভেঙে সর্বস্তরের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে ছাত্রদের ডাকে। সেনাবাহিনী সামাল দিতে পারছিল না। এই পরিস্থিতিতে ৪ আগস্ট হিন্দুদের উপর হামলা শুরু হয়। ৫ আগস্ট থেকে ব্যাপক আকার ধারণ করে। জেলার পর জেলা আক্রান্ত হতে শুরু করে। হিন্দুদের বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও মন্দিরে লুটপাট, আগুন দেওয়ার ঘটনা বাড়তে থাকে। ৫ তারিখ থেকে কার্যত প্রশাসন ছিল না, পুলিশ বাহিনী ধর্মঘট শুরু করে তাদের ওপর পরিচালিত হামলার কারণে।

এই অচিন্তনীয় পরিস্থিতিতে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকার রাস্তায় নেমে আসে প্রতিবাদ জানাতে। সেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পথ ধরে তারা ‘সনাতনী অধিকার আন্দোলন’ এর ব্যানারে শাহবাগে জড়ো হয় ৯ আগস্ট দুপুরে। স্লোগানে সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। মাত্র কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী, কিন্তু বার্তা পৌঁছে যায় রাজধানী ও তার আশেপাশে। ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে শাহবাগ এক বিশাল জনসমুদ্রের রূপ নেয়। সববয়সি হিন্দু নারী-পুরুষ ছুটে আসেন সমাবেশে। সঙ্গে নিয়ে আসেন ছোটো ছোটো বাচ্চাদেরও, সবার মাথায় বাঁধা ছোটো আকারের বাংলাদেশের পতাকা। সাম্প্রদায়িক হামলার মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে এভাবে রাস্তায় নেমে আসা এবং বিক্ষোভে ফেটে পড়া বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম। সাধারণত সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে নিরাপদে বাড়িঘরে থাকাই হিন্দুরা সবসময় শ্রেয় মনে করেন। ১৯৯০ ও ১৯৯২ সালে বাবরি ধাঁচা ভাঙার ঘটনায় কিংবা ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর হিন্দুদের ওপর ব্যাপক হামলা, বাড়িঘর, দোকানপাট ও মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল। এছাড়া, ২০১৪ সালে নির্বাচনের পরও হামলা হয়। কিন্তু এভাবে প্রতিবাদ হয়নি। সংগঠনগতভাবে প্রতিবাদ হয়েছে। সমাবেশ, মানববন্ধন হয়েছে। সাধারণত দেখা যায়, হামলার তীব্রতা কমে এলে ভারত চলে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। কমদামে জায়গাজমি বিক্রি করে চলে যান ভারতে।

এবারই প্রথম ব্যতিক্রম ঘটলো, সমস্ত ঝুঁকি মাথায় নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা রাস্তায় নেমে এল। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী নেই, চারদিকে বিশৃঙ্খলা। তার মধ্যেই গর্জে উঠলো, বাংলাদেশ ছাড়বো না। ঐতিহাসিক শাহবাগ চারদিন ধরে গর্জন শুনলো। রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র শাহবাগ, চারদিকের সড়ক বন্ধ হয়ে গেল। ঢাকার প্রায় সব এলাকা থেকেই হিন্দু নর-নারীর মিছিল এল, চলো— চলো শাহবাগ চলো। শাঁখা-সিন্দুর লুকিয়ে নয়, যা তারা করেন সাম্প্রদায়িক হামলা হলে, গর্বের সঙ্গে মিছিলে পা মেলালেন হিন্দু নারীরাও। সবচেয়ে আশ্চর্যের, কোনো সংগঠন এই বিক্ষোভের ডাক দেয়নি, সংগঠিত করেনি। কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ পড়ুয়া ছাত্র ও ছাত্রী নেতৃত্ব দিয়েছে বিক্ষোভে। গর্জে উঠে বলেছে, এদেশ ছাড়বো না। ঢাকার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর কয়েকটি জেলায়ও এভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের ডাকে হিন্দুরা রাস্তায় নেমে এসেছে।

শাহবাগের আরও কিছু স্লোগান এখানে তুলে ধরা হলো : ‘তুমি কে আমি কে, বাঙ্গালি বাঙ্গালি’, ‘তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা’, ‘কথায় কথায় বাংলা ছাড়, বাংলা কি তোর বাপদাদার’, ‘জন্ম আমার এই দেশে, মরণ হবে এই দেশে’, ‘শাসক আসে শাসক যায়, হিন্দুরা কেন মার খায়’, ‘লাখো মানুষের রক্তে কেনা, দেশটা কোনো ধর্মের না’, ‘জাগো জাগো হিন্দু জাগো’, ‘আমার মা বোন বাবা ভাই আক্রান্ত কেন, জবাব চাই জবাব চাই’,। ‘লাখো মানুষ জীবন দিয়েছে, সব ধর্মের অধিকার আছে’, ‘হিন্দুরা কেন মার খায়, বিশ্বনেতাদের নজর

চাই', 'জাস্টিস জাস্টিস, উই ওয়ান্ট জাস্টিস' ইত্যাদি।

বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে 'সনাতনী অধিকার আন্দোলন'-এর পক্ষ থেকে আট দফা দাবি জানানো হয়। এগুলো হচ্ছে, (১) সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিচারের জন্য 'দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল' গঠন করে দোষীদের দ্রুততম সময়ে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান, ক্ষতিগ্রস্তদের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। (২) অনতিবিলম্বে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে। (৩) সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে। (৪) হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টকে হিন্দু ফাউন্ডেশনে উন্নীত করতে হবে। একই সঙ্গে বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টকেও ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করতে হবে। (ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্যে ইসলামি ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছিল ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে। এই ফাউন্ডেশন পরিচালনার অর্থ আসে বাজেট বরাদ্দ থেকে। তখন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানদের জন্যে কিছু করা হয়নি। সেনাশাসক এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর তিন সম্প্রদায়ের জন্য তিনটি পৃথক ট্রাস্ট গঠন করা হয়। এই তিন ট্রাস্ট পরিচালিত হয়ে আসছে সরকারের বরাদ্দ থেকে প্রাপ্ত সুদ থেকে। তখন থেকেই সম-মর্যাদায় ফাউন্ডেশন গঠনের দাবি জানিয়ে আসছে সংখ্যালঘুরা) (৫) দেবোত্তর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করতে হবে। অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে। (৬) সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের জন্য উপাসনালয় নির্মাণ ও প্রতিটি হোস্টেলে প্রার্থনাকক্ষ বরাদ্দ করতে হবে। (৭) সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ড আধুনিকীকরণ করতে হবে এবং (৮) শারদীয়া দুর্গাপূজায় পাঁচ দিন ছুটি দিতে হবে। পাশাপাশি প্রত্যেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসবে প্রয়োজনীয় ছুটি প্রদান করতে হবে। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ 'সনাতনী অধিকার আন্দোলন'-এর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। পরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রসমাজের সমন্বয় করা সনাতনী অধিকার আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে তাদের দাবি সম্পর্কে অবহিত হন এবং আদায়ে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। সনাতনী অধিকার আন্দোলনের নেতারা অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মহম্মদ ইউনুসের সঙ্গেও দেখা করে দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদ জানান এবং দাবিগুলো তাঁকেও অবহিত করেন। হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরা যে আগুন শাহবাগে জ্বালিয়ে দিয়েছে তা গোটা দেশে এক নতুন বার্তা পৌঁছে দেয়। সাংগঠনিক ও নিয়মানুগ আন্দোলন-প্রতিবাদের বাইরে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এভাবে ফেটে পড়া নতুন প্রজন্মের চোখ খুলে দিয়েছে।

ড. ইউনুসকে খোলাচিঠি

শাহবাগে ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভের প্রথম দিনে অন্যদিকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মহম্মদ ইউনুসের খোলাচিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ। চিঠিতে বলা হয়েছে, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর এর মধ্যে ৫২টি জেলায় সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। সারা দেশের সংখ্যালঘুদের মধ্যে গভীর শঙ্কা, উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা ছড়িয়ে পড়েছে। অবিলম্বে এ অবস্থার অবসান চান তাঁরা।

'সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ড. মুহম্মদ ইউনুসের প্রতি খোলাচিঠি' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন করে সংগঠন দুটি। ৯ আগস্ট সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এ সংবাদ সম্মেলনে সংগঠন দুটি এই খোলাচিঠি তুলে ধরে। সংবাদ সম্মেলনে খোলাচিঠি পাঠ করেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি নির্মল রোজারিও। তিনি বলেন, 'ছাত্র-জনতার এই আত্মদান, ত্যাগ ও সংগ্রাম বাংলাদেশে জাগরণের যে চেতনা প্রজ্বলিত করেছে, তা যেন কখনো কেউ নিভিয়ে দিতে না পারে, মুক্তিযুদ্ধ যেন পথ না হারায়। এই বিজয় যখন চূড়ান্ত লক্ষ্য অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছে, অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে একটি বিশেষ গোষ্ঠী সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নির্বিচার তুলনাহীন সহিংসতা ছড়িয়ে এই অর্জনে কালিমা লেপন করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।'

প্রাপ্ত সাংগঠনিক বিবরণ ও গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ইতিমধ্যে অন্তত ৫২টি জেলায় এই সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় হাজার হাজার হিন্দু পরিবার সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে বলেও খোলাচিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়, 'অনেক মন্দির হামলার পর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, অনেক নারী নিগৃহীত হয়েছেন। কয়েকটি স্থানে হত্যার ঘটনাও ঘটেছে। আক্রান্ত হয়েছে অন্য সংখ্যালঘুরাও। মূলত ৪ আগস্ট থেকে এই সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। সারা দেশের সংখ্যালঘুদের মধ্যে গভীর শঙ্কা, উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা ছড়িয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক ভাবেও বাংলাদেশকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। আমরা অবিলম্বে এ অবস্থার অবসান চাই।' রাষ্ট্রপতি, সেনাপ্রধান, সংগ্রামী ছাত্রনেতৃত্ব ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছে এ অবস্থা জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে। খোলাচিঠিতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'তাঁরাও তাঁদের বক্তব্য-ভাষণে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি তিন দিন ধরে গভীর শূন্যতার মধ্যে পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। আর্তনাদ প্রলম্বিত হচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের সুচনালগ্নেই আপনার কাছে অত্যন্ত বিনীতভাবে আমাদের উদ্বেগ ও বেদনার জায়গাটি তুলে ধরছি এই প্রত্যাশায় যে আপনি ও আপনার সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এই সংকট নিরসনে দ্রুত পদক্ষেপ নেবেন, যাতে ছাত্র-জনতার বিজয় কলুষিত না হয় এবং ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই রক্তক্ষরণের অবসান ঘটে।'

এই সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি বাসুদেব ধর। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজল দেবনাথ। এক প্রশ্নের জবাবে কাজল দেবনাথ বলেন, দেশে কোনো ঘটনা ঘটলেই সংখ্যালঘুদের হামলা, নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। ৪ আগস্ট থেকে সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটলেও তা বন্ধে পদক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ করেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আইনজীবী সুব্রত চৌধুরী।

সংবাদ সম্মেলন সঞ্চালনা করেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মণীন্দ্র কুমার নাথ। এ সময় তিনি গত চার দিনে সংঘটিত সব সাম্প্রদায়িক হামলার সুষ্ঠু তদন্ত বিচার দাবি করেন।

মহিলা চিকিৎসকের নৃশংস হত্যা তৃণমূল সরকারের মুখোশ খুলে দিয়েছে

আনন্দ মোহন দাস

গত ৯ আগস্ট এযাবৎকালের নিকৃষ্টতম ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে গেল এরাজ্যের রাজধানীর একটি নামকরা হাসপাতালে। প্রখ্যাত সমাজসেবী ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের নামাঙ্কিত আরজি কর হাসপাতালে একজন ৩২ বছরের তরুণী পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনি ডাক্তারকে বলাৎকার করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো। সভ্যতা ভদ্রতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করে বিশ্ব দরবারে এবং তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গকে কলঙ্কিত করে নারীর সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করা হলো। রাতের অন্ধকারে বলাৎকার করে নারকীয় হত্যাকাণ্ড সামাজিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শিত হলো। কলকাতার প্রখ্যাত সরকারি হাসপাতালে সুরক্ষার ঘেরাটোপে থেকেও একজন ডাক্তার রাতে ধর্ষিতা হয়ে খুন হলেন এবং প্রমাণ হলো হাসপাতালে ডাক্তারদের নিরাপত্তা নেই। বিশেষভাবে মহিলাদের কোনো সুরক্ষা নেই রাজ্যের হাসপাতালে। তাহলে সাধারণ মানুষের কী হবে! প্রশ্ন উঠছে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিচ্ছেন, বাড়ির লক্ষ্মীরা সুরক্ষিত তো! তাই এই জঘন্য নারকীয় হত্যাকাণ্ড সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের চোখ খুলে দিয়েছে। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতির ফলে সরকারি হাসপাতালের সুরক্ষার ঘেরাটোপে থেকেও যেভাবে এক সম্ভাবনাময় তরুণী ডাক্তারের প্রাণ চলে গেল তার ধিক্কার জানাবার ভাষা নেই। মৃত্যুর প্রথম চারদিনে কেবলমাত্র একজন সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করে রাজ্য সরকার প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ উঠেছে।

অভয়ার মৃত্যুর পর তাঁর মা-বাবাকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কখনও জানিয়েছেন, তাঁদের মেয়ে অসুস্থ। আবার কখনও জানিয়েছেন, মেয়ে সুইসাইড করেছে। এই ধরনের পরস্পর বিরোধী বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ তাঁর বাবা-মাকে বিচলিত করেছে। অন্যান্যদের ঘটনাস্থলে প্রবেশ করার সুযোগ থাকলেও বাবা-মাকে তিন ঘণ্টা মেয়ের মৃতদেহ দেখতে দেওয়া হয়নি। অভয়ার মা এর মধ্যে দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্য রয়েছে বলে মনে করেছেন এবং এদের মধ্যেই মেয়ের খুনি লুকিয়ে রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। এ সমস্ত ঘটনাবলিতে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহের উদ্রেক হয়। পরবর্তীকালে অতি দ্রুততার সঙ্গে রাতের অন্ধকারে মৃতদেহ পুড়িয়ে দেওয়া হলো এবং তৎপরতার সঙ্গে অকুস্থল সেমিনার হল ভেঙে দিয়ে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ লোপাট করা হলো। এই সমস্ত পর্যায়ক্রমিক ঘটনায় মানুষের মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। প্রকৃত ঘটনা থেকে কাউকে আড়াল করার চেষ্টা বলে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এই হাসপাতালের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এতই প্রভাবশালী যে ডাক্তারি ছাত্র আন্দোলনের চাপে পদত্যাগ করলেও পুনরায় চার ঘণ্টার মধ্যে রাজ্য সরকার অন্য একটি হাসপাতালে অধ্যক্ষ পদে তাকে বদলি করে। অর্থাৎ এই বদলির নির্দেশের মাধ্যমে তাকে পুরস্কৃত করা হলো। যদিও রাজ্য সরকারকে ভর্ৎসনা করে উচ্চ আদালতের আদেশে তাকে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে আরজি করে তরুণী চিকিৎসককে বলাৎকার ও হত্যায় অভিযুক্তদের বাঁচানোর প্রয়াস চলেছে। অস্বাভাবিক দেরিতে এফআইআর দাখিলেও সুপ্রিম কোর্ট পুলিশের ভূমিকায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে পুলিশকে ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সর্বোচ্চ আদালত তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন।

সংবাদে প্রকাশ, এই হাসপাতালে নাকি মদ, গাঁজা, ড্রাগের সান্ধ্যকালীন নিত্য আসর বসে এবং আরও অনেক অসামাজিক কাজ হয়ে থাকে। একটি চক্র রয়েছে যারা জাল ওষুধের পরিবর্তে ভালো ওষুধ পাচার করে প্রভাবশালী মহলের পকেট ভরে দেয় এবং এমনকী মৃতদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গও টাকার বিনিময়ে পাচার করে থাকে। এই সমস্ত কাজকর্ম নাকি স্বয়ং অধ্যক্ষের মদতে হয়ে থাকে বলে অভিযোগ উঠেছে। তাছাড়া টেন্ডার, সিসিটিভি ইত্যাদির বিষয়ে প্রভাবশালী প্রাক্তন অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এমনকী এই হাসপাতালে টাকার বিনিময়ে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ-ফেল নির্ধারিত হয়। এই সমস্ত অর্থ কাদের পকেট ভরে? প্রভাবশালী মহলের সমর্থন ছাড়া কি সম্ভব? এ বিষয়গুলি তরুণী চিকিৎসক জেনে ফেলেছিলেন বলেই কি তার নৃশংস হত্যা? সেজন্য কলকাতা হাইকোর্ট আর্থিক দুর্নীতির তদন্ত করতে রাজ্য সরকারের সিটের পরিবর্তে সিবিআই

তদন্তের আদেশ দিয়েছে। সর্বোপরি উচ্চ আদালতের নির্দেশে আরজি করের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের তদন্ত সিবিআইকে হস্তান্তর করেছে। যদিও একজনের গ্রেপ্তারি ছাড়া এখন পর্যন্ত বিশেষ কিছু তদন্তের অগ্রগতি জানা যায়নি। প্রথম চারদিন ঘটনার তদন্ত করেছিল কলকাতা পুলিশ। সেজন্য এই চারদিনে তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগও উঠেছে। এছাড়াও গত ১৪ আগস্ট রাতে আরজি কর হাসপাতালের প্রায় ৭ হাজার বহিরাগত গুন্ডা ভাঙচুর ও লুঠপাট করেছে। এমনকী ডাক্তারদের প্রতিবাদ মঞ্চ ও হাসপাতালের জরুরি বিভাগেও ভাঙচুর করে লুঠ করেছে। আন্দোলনকারীদেরও ভয় দেখানো হয়েছে। এর জন্য সুপ্রিম কোর্ট পুলিশের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেছেন।

আরজি করে জুনিয়র ডাক্তারের হত্যা কাণ্ডের পর থেকে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সংঘটিত প্রতিবাদ— আন্দোলন, ধরনা ও বিক্ষোভ দানা বেঁধেছে। দলমত নির্বিশেষে এবারের প্রতিবাদ আন্দোলন কিছুটা ভিন্ন ধরনের। এই পাশবিক হত্যার প্রতিবাদে কেবলমাত্র ভারতে নয়, বিশ্বের অনেক দেশেই বিচার চেয়ে প্রতিবাদের আওয়াজ উঠেছে। এবারের আন্দোলন জনআন্দোলনে পরিণত হয়েছে। যতক্ষণ না নির্যাতিতা সুবিচার পাচ্ছে, এই আন্দোলন চলবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। বলাবাহুল্য এই নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে নিরন্তর আন্দোলন সংগঠিত হয়ে চলেছে।

গত ১৪ আগস্ট রাতে অসংখ্য নর-নারীর উপস্থিতিতে অভিযুক্তের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে রাত দখল আন্দোলন নামে সারা বঙ্গে প্রতিবাদ সংঘটিত হলো। 'ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান'-এর বাণী স্মরণ করে রাস্তায় নেমে মেয়েদের শঙ্খধ্বনি ও জনআন্দোলনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেন এবং বিশেষভাবে মহিলাদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো ছিল। একমাত্র দাবি ছিল ধর্ষকের ফাঁসি এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি চাই। একটাই স্লোগান, 'We want justice.'

এরই মধ্যে স্বভাবসিদ্ধভাবে সামাজিক মাধ্যমে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন একদল আন্দোলনজীবীদের তরফে শাঁখ ও জাতীয় পতাকায় আপত্তি তুলে ভিন্ন সুর তুলে ধরা হলো। এর উদ্দেশ্য হলো আন্দোলনকে কমজোর করে প্রতিবাদের আওয়াজকে দুর্বল করা। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ আছড়ে পড়লো ক্রীড়াক্ষেত্রেও। এমনকী ঘটি বাঙ্গালের বিভেদ ভুলে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ক্লাবের সমর্থকরাও সল্টলেক স্টেডিয়ামের বাইরে আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে স্লোগান তুলেছে, 'জোট বেঁধেছে বাঙ্গাল ঘটি, ভয় পেয়েছে হাওয়াই চটি।' 'ঘটি বাঙ্গালের এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজি কর।' হাজার হাজার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে 'বিচার চাই' স্লোগান তুলে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চেয়েছে।

কিন্তু দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহধন্য কিছু বিশিষ্টজনদের বেসামাল বিবৃতি। মাত্র এক টাকায় জমি পাওয়া শিল্পপতি ও প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে নারকীয় ঘটনাকে লঘু করার চেষ্টা করলেন। তার ফলে সামাজিক মাধ্যমে ধূমায়িত জনরোষ এবং তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার প্রতিফলন দেখা গেল। এই জঘন্য ন্যক্কারজনক ঘটনার বিরুদ্ধে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের নীরবতাও সমাজমাধ্যমে সমালোচিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ তাদের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তারপর শাসকের নির্দেশে তাদের তরফে 'ধর্ষকের ফাঁসি চাই' বলে আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার এবং আসল অপরাধীদের আড়াল করার কুম্ভীরাশ্রু প্রদর্শিত হলো। শাসকদল নিজেদের অকর্মণ্যতা ঢাকতে ও ডাক্তারি ছাত্রদের আন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত করতে আন্দোলনের নাটক করে বিচার চাইলেন এবং ধর্ষকের ফাঁসির দাবি তুললেন।

কিন্তু প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর তরফে ধর্ষকের ফাঁসির বদলে দাবি উঠলো, 'নির্যাতিতার ফাঁসি চাই।' এই স্লোগান কী সত্যিই স্লিপ অফ টাং? নাকি অন্য কিছু! নির্যাতিতা ও মৃতার পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধের অপচেষ্টাকে সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে কটাক্ষ করলেন। তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি এই নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে কার বিরুদ্ধে আন্দোলন করলেন? তিনি নিজেই মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং তিনিই সরকারের প্রধান হিসেবে আইন শৃঙ্খলার অবনতির জন্য দায়ী নয় কি? সুতরাং তিনি কি নিজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে বিশ্ব রেকর্ড করলেন? কিন্তু মানুষ তাঁর এই ভাঁওতাবাজি ধরে ফেলেছেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তা কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। তিনি নিজেকে সংবেদনশীল প্রমাণ করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি লিখে ধর্ষণের ঘটনা বন্ধ করতে কড়া আইন আনার পাশাপাশি ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টের মাধ্যমে দ্রুত বিচার প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট আইনের ধারায় দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার দাবি করেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী জবাবে জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে ৪৮৬০০টি ধর্ষণ ও পকসো মামলা ঝুলে রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টগুলিতে সেসব মামলার শুনানির জন্য তৎপরতা দেখায়নি রাজ্য সরকার। আরও বলেছেন বারবার বলা সত্ত্বেও রাজ্যের মহিলা ও শিশুদের সাহায্যার্থে ১৮১১০৯৮ হেল্পলাইন দুটি চালু করা হয়নি। চালু করা হয়নি এমার্জেন্সি রেসপন্স সাপোর্ট সিস্টেম এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনও ১১টি ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্ট চালু করেনি। অথচ অন্যান্য রাজ্য সরকার এ বিষয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে। সুতরাং এর জবাব মুখ্যমন্ত্রীকে দিতেই হবে। কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দায় ঠেলে নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া চালাকি ছাড়া কিছু নয়। সেজন্য দীর্ঘ আন্দোলনের ঝাঁঝ পাওয়া যাচ্ছে।

এই ইস্যুতে ছাত্র সংগঠন বিদ্যার্থী পরিষদও স্বাস্থ্য ভবন অভিযান করে ন্যায্য বিচারের জন্য আন্দোলন করেছে। তারা এই আন্দোলন বিভিন্ন জেলায় দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে বিজেপির তরফেও গত ১৪ আগস্ট কলেজ স্কোয়্যার থেকে আরজি কর পর্যন্ত ধিক্কার মিছিল, শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে ধরনা এবং গত ২২ আগস্ট স্বাস্থ্যভবন অভিযান করে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করলেন। স্লোগান উঠলো, 'দাবি এক, দফা এক/মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ।'

ছাত্রসমাজ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ২৬ আগস্টের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ না করলে, তাঁর পদত্যাগ ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ছাত্রসমাজের আহ্বানে ২৭ আগস্ট নবান্ন ঘেরাও অভিযান কর্মসূচি সফল হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের ওপর রাজ্য সরকারের চরম দমন পীড়ন চলেছে। তা সত্ত্বেও যতক্ষণ না পর্যন্ত ধর্ষকের ফাঁসি ও অন্যান্য দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি হয়, এই প্রতিবাদ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া তাদের লক্ষ্য। তা না হলে সমাজবিরোধীদের দ্বারা কামদুনি, পার্ক স্ট্রিট, কাকদ্বীপ, সিউড়ি, কাটোয়া, কালিয়াগঞ্জ, হাঁসখালি ও আরজি করের মতো নারকীয় ঘটনা ঘটতেই থাকবে এবং ধর্ষক খুনিদের সাহস বৃদ্ধি পাবে। সেজন্য দ্রুত সিবিআই তদন্ত শেষ করে প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ চাই। তাছাড়া এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে মূল মাথা কে খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি প্রদান করতে হবে। □

দুর্নীতি নিমজ্জিত পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ক্ষেত্র কোথায় দাঁড়িয়ে

সুদীপ্ত গুহ

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাঙ্গালির কাছে আদর্শ ছিল ডাক্তার ও শিক্ষকরা। যাদের একটা বড়ো অংশ পরিস্থিতির চাপে আজ ভিলেন। কথা সাহিত্যিকদের কলম বা চলচ্চিত্রের মূল চরিত্র ছিলেন ডাক্তার বা শিক্ষক। আশির দশক থেকে অবস্থান পরিবর্তন হয়। যে বাঙ্গালির কাছে ডাক্তার মানে ছিল বনফুলের লেখা অগ্নিশ্বর মুখোপাধ্যায়, সেই বাঙ্গালির কাছে যখন সুচিত্রা ভট্টাচার্য আড়াই দশক পরে তার পূজাসংখ্যার উপন্যাসে তুলে ধরেন 'অলীক সুখ'-এর কিংশুক গুহকে, বাঙ্গালি কিন্তু কষ্ট পেলেও, আশ্চর্য হয়নি। আর এর দুই দশক পরে আমরা সন্দীপ ঘোষ, শ্যামাপদ দাস বা বিরুপাক্ষ বিশ্বাসদের কাহিনি জানতে পারছি। প্রথমজন একটি কলেজের অধ্যক্ষ, দ্বিতীয়জনকে লোকজন বলে অলিখিত স্বাস্থ্যমন্ত্রী, তৃতীয়জন একজন ইন্টার্ন যিনি একজন অধ্যক্ষার ছেলে-মেয়েদের কিডন্যাপের হুমকি পর্যন্ত দেন এবং তাকে একটু বাজে গালাগালি দেন। কিন্তু কে এঁদের শক্তি? কীভাবে অধঃপতন?

এখানে একটা ত্রিস্তরীয় সমান্তরাল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে, যার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি লেন-দেন থেকে টাকা তোলা। উপরমহল থেকে এই ত্রিস্তরকে একটা এমন সংবিধান বহির্ভূত শক্তি দেওয়া হয়েছে যে, এঁদের যে কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করা কোনো পক্ষে সম্ভব নয়। ভর্তিতে দুর্নীতি, পরীক্ষায় অসৎ উপায় অবলম্বন, ইন্টার্নদের থিসিস পাশের জন্য টাকা, চায়ের দোকানের থেকে কমিশন, ওষুধের থেকে কমিশন, রোগী ভর্তির জন্য দালাল চক্রের মাধ্যমে কমিশন, মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলিতে ভালো যন্ত্রপাতি, ওষুধ-সহ চিকিৎসার সব সরঞ্জাম কেনার টেন্ডার থেকে কাটমানি এবং সেই সরঞ্জাম পাচার ইত্যাদি বিভিন্ন দুর্নীতি সংগঠিত হতো একটা সম্পূর্ণ স্ট্রাকচার্ পদ্ধতিতে। এছাড়া মৃতদেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাচারের একটা চক্র গড়ে ওঠে। গরিব মানুষ মারা গেলে তাঁর আত্মীয়দের খবর দেবার আগেই বিভিন্ন অঙ্গ কেটে নিয়ে বিক্রি করা হতো বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে। অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে যখন পরিবার পরিজন ভীষণ মানসিক কষ্টে থাকে, তখন তাঁদের থেকেও ঘুষ নেওয়া হতো দেহ ছাড়ার জন্য। দরিদ্র মানুষ ঘুষ না দিলে, মৃতদেহ সেলাই না করে দিয়ে দেওয়া হতো। একদল তৃণমূলি ডাক্তারদের কাছাকাছি নার্সিংহোম আছে। হাসপাতালে অপারেশন ডেট পিছিয়ে তাঁদের বাধ্য করা হয় সেখানে পয়সা খরচ করে অপারেশন করাতে। বিভিন্ন প্যাথলজি টেস্ট বা রেডিয়োলজি টেস্টের খরচ বেড়ে যায়। তাই ইচ্ছা করে ডাক্তারের এপয়েন্টমেন্ট পিছিয়ে বাধ্য করা হতো দালাল ধরে ঘুষ দেবার জন্য। মেডিক্যাল কলেজে হেন কোনো আলপিন কেনা হয় না, যার থেকে এই সিন্ডিকেট সুবিধা পায় না।

এছাড়া কলেজগুলিতে নানা যৌন ব্যভিচার ও ড্রাগস/মাদকদ্রব্য চক্র চালাতো একটা চক্র, যেখানে সরাসরি কমিশন নেয় এই সিন্ডিকেট। রোগীদের আত্মীয়দের বিশ্রামের জায়গাকে গেস্ট হাউস বানিয়ে সেখানে চালানো হতো মধুচক্র। বহু ছাত্রী এবং নার্সকেও খারাপ প্রস্তাব দেওয়া হতো। সম্ভবত আমাদের ছোটো বোন বেচারি 'অভয়া' এই সব জানতে পারে এবং প্রতিবাদ করে বলে এই সিন্ডিকেট তাকে শেষ করে দেয়। নইলে মৃত্যুর পরে কার নির্দেশে পুলিশ থেকে উকিল ওই সেমিনার রুমে এসে হাজির হয়? তাহলে এই অনৈতিক ব্যবসার শেয়ারহোল্ডার কি তারাও? নইলে একজন কলেজ অধ্যক্ষের কি ক্ষমতা যে তাঁর ডাকে

পুলিশ উকিল সবাই এসে হাজির হয় ও এমন একটা ঘটনায়?

দুর্নীতির জাল কতদূর বিস্তৃত জানতে হলে কোভিড পর্বে স্বাস্থ্য দুর্নীতি নিয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। যে কলকাতায় একসময় ম্যালেরিয়া থেকে ডেঙ্গুর প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়, যে কলকাতা টেস্ট টিউব বেবি আবিষ্কার করে, সেই কলকাতা এই কোভিড মহামারিতে এবার মানবসমাজকে কিছুই দিল না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রথম দিন থেকে ভ্যাকসিন, অক্সিজেন, ওষুধের জন্য দিল্লির উপর দোষ চাপান। শেষে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, তেলেঙ্গানা থেকে আসে কিট, অক্সিজেন, ওষুধ, ভ্যাকসিন। সেক্ষেত্রেও বহুরকম দুর্নীতিতে জড়ায় স্বাস্থ্য দপ্তর। দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ওয়ান ম্যান কমিশন তৈরি করেন। আজও রিপোর্ট সামনে আসেনি এই কমিশনের। কারণ বলাই বাহুল্য। দুর্নীতি স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিটি টেবিলে।

এছাড়া আছে পোস্টিং দুর্নীতি। আমরা বিভিন্ন উপন্যাস, সিনেমা বা সংবাদপত্র থেকে জেনেছি পুলিশে নাকি প্রাইজ পোস্টিং হয়। সোজাকথায়, প্রাইজ পোস্টিং মানে যেখানে দুর্নীতি থেকে আয় বেশি। পশ্চিমবঙ্গ এমন এক রাজ্য যেখানে স্বাস্থ্য দপ্তরের মতো এক দপ্তরেও এই সংস্কৃতি নিয়ে এসেছে তৃণমূল সরকার। সন্দীপ ঘোষের মতো সরকার ঘনিষ্ঠ ডাক্তারদের পদোন্নতি, তাদের জন্য প্রাইজ পোস্টিং, সব রকম অপরাধচক্রের পেছনে আছে শ্যামাপদ দাসদের প্রত্যক্ষ- পরোক্ষ মদত। অথচ এই শ্যামাপদ দাস কোনো সরকারি পদে নেই।

আরজি কর কাণ্ডের তদন্তে যাতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এই ভয়াবহ আর্থিক দুর্নীতির পর্দাফাঁস না হয়, তার জন্য সরকারের পদলেহনকারী কিছু পুলিশ আধিকারিকদের দিয়ে রাজ্য সরকারের তরফে সিট গঠন করে রাজ্য। দ্বিতীয় দিন মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে আসায় তারা বোঝে এই জল অনেক দূর গড়াবে। তাই যতটা সম্ভব প্রমাণ লোপাট করে দেয় রাজ্য পুলিশ এবং স্বাস্থ্য দপ্তর। সিবিআই এবং ইডিকে স্বাস্থ্যভবনে ঢোকা আটকাতে তৎপর হয় রাজ্য।

রাঘববোয়ালদের বাঁচাতে বলির পাঁঠা করা হয় এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের অন্যান্য দপ্তরের মতো এখানেও সিভিক ভলান্টিয়ারদের দৌরাত্ম্য ভীষণ। ডাক্তাররা ভয় পায় এদের। এবার হাসপাতালগুলিতে দালালদের সঙ্গে যোগসাজশে তাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ চক্র,--- আরজি করে ধৃত সঞ্জয়কে কি প্রভাবশালীদের বাঁচাতে বলির পাঁঠা করা?

স্বাস্থ্য দপ্তর কেন্দ্রের টাকায় একের পর এক পরিকাঠামোহীন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি করে রেখেছে যেখানে ডাক্তাররা সপ্তাহে দুইদিন আসে এবং অধিকাংশ যন্ত্র খালি পড়ে আছে। বিনে পয়সায় চিকিৎসার নামে এখানে চলে রেফার করার চক্র। রায়গঞ্জ বা বাঁকুড়ার এই হাসপাতালে যাওয়া মানেই কলকাতার হাসপাতালে রেফার। তারপরে গরিব মানুষ পড়ে এই সন্দীপ-শ্যামাপদদের ফাঁদে।

কিন্তু সমস্যার সমাধান কী?

প্রথমত, চিকিৎসাপ্রার্থীকে ভিখারি ভাবলে চলবে না। দ্বিতীয়ত, ডাক্তারদের মাইনের সঙ্গে ইন্সেন্টিভ ব্যবস্থা যেমন টাটা ইত্যাদি হাসপাতালে চলে।

সরকারি হাসপাতালকে ফ্রি চিকিৎসা না দিয়ে, গরিব মানুষের হাতে ইন্সুরেন্স পলিসি তুলে দিতে হবে। ফ্রি চিকিৎসা ব্যবস্থা চললে সরকারি প্রতিষ্ঠান সাধারণ মানুষকে ভিখারি ভাবে। অথচ ওই প্রতিষ্ঠান চলে সাধারণ মানুষের করের টাকায়। প্রতিটি পণ্য এবং পরিষেবা নেওয়ার সময় দরিদ্রতম মানুষও কর দেয়। ফলে তাকে একটা সরকারি হাসপাতাল বা স্কুল ভিখারি ভাবতে পারে না। ঠিক এই ভাবনায় আনা হয় আয়ুষ্মান ভারত। এমন একটা ইন্সুরেন্স পলিসি যা দেশের সব হাসপাতালে চলে। একজন কোটিপতির নিজস্ব ইন্সুরেন্স পলিসি হোক বা গরিবের আয়ুষ্মান ভারত পলিসি হোক, দুইজনকেই পরিষেবা দিতে বাধ্য দেশের যে কোনো হাসপাতাল। অন্যদিকে সরকার তা সরাসরি হাসপাতালকে না দিয়ে যদি এই ধরনের পলিসির প্রিমিয়াম দেয়, তবে সেই পলিসি থেকেই চলে যাবে সরকারি মেডিক্যাল সিস্টেমও। তবে ডাক্তারদের এর সঙ্গে দিতে হবে কিছু ইন্সেন্টিভ। তাতে কমবে দুর্নীতি। একদিকে গরিবের স্বাস্থ্য পরিষেবা বিনা খরচে হলো অন্যদিকে কেউ তাঁর কাছে ঘুষ চাইবে না কিছু পাইয়ে দেবার বিনিময়ে।

আমার এই প্রস্তাব শুনে অনেক বামপন্থী চেঁচিয়ে বলবেন আমি কি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বেসরকারি করার কথা বলছি? না। সরকার বিদ্যুৎ বিল যদি নিতে পারে, টোল ট্যাক্স নিতে পারে, জল কর নিতে পারে, রেল ভাড়া নিতে পারে, তবে কেন শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যকে ফ্রি করার নামে এই দুটি মূল জায়গাকে ধ্বংস করবে? শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে চূড়ান্ত দুর্নীতি, অদক্ষতা ও অপদার্থতার উৎস হলো শিক্ষার্থী ও চিকিৎসাপ্রার্থীর প্রতি সরকারি বাবুদের অবজ্ঞা। দেশের গরিবরা নিশ্চয়ই ফ্রি চিকিৎসা পাবে, কিন্তু কেউ যেন তাকে অবজ্ঞা না করে এবং তাকে যেন পরিষেবা পাওয়ার জন্য উৎকোচ দিতে না হয়। সে যেন মাথা উঁচু করে হাসপাতালে ঢুকতে পারে। অ্যাপোলো, ফর্টিস বা মুম্বাইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালে যারা চিকিৎসা করান তারা কি গ্যাঁটের পয়সায় চিকিৎসা করান? ৯৯ শতাংশ গ্যাঁটের পয়সা খরচ করেন না। তারা ইন্সুরেন্স পলিসিটা ধরিয়ে দেন। কিন্তু তাঁদের ওই হাসপাতালে স্যার বা ম্যাডাম বলে ডাকা হয়। তাহলে কেন সরকারি হাসপাতালে রোগীদের ভিখারির মতো ব্যবহার করা হবে? রাজ্য সরকার হাসপাতালকে ভরতুকি না দিয়ে গরিব মানুষকে একটা সঠিক চিকিৎসাবিমার পলিসি ধরিয়ে সেই পলিসির প্রিমিয়ামটা পেমেন্ট করুক না? যেমনটি করা হয় আয়ুষ্মান ভারতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য সাথী পলিসি এতটাই অস্বচ্ছ যে অধিকাংশ বেসরকারি হাসপাতাল সেটা নিতে চায় না। নিলেও চিকিৎসা ঝুলিয়ে রাখে। দেরি করে। সরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ভিখারির মতো ব্যবহার করে এবং তাঁদের কাছে ঘুষ চায়। পরিষেবা পায় না মানুষ। এমনও ঘটেছে, যে দালাল চক্র এসে একজনের স্বাস্থ্য সাথী কার্ডে অন্য জনের চিকিৎসা করিয়ে গেছে। তাই প্রয়োজন স্বচ্ছতা। সঠিক পলিসি প্রণয়ন। এবং অবশ্যই সরকারের নৈতিক সততা।

প্রশাসন তার জনগণকে সামাজিক সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ কেন

প্রশাসন তার জনগণকে সামাজিক সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে কেন? বর্তমান রাজ্য সরকারকে শুরু থেকেই দেখছি ধর্ষণকারী, খুনি, মাফিয়া, গুন্ডাদের পক্ষ অবলম্বন করতে। জনাদেশ পেয়ে সরকার গঠন মানে এই নয় যে জনগণের ভাবাবেগে আঘাত করা, পদদলিত করা। অভয়া কাণ্ডে সরকারের সেই স্বৈরাচারী মানসিকতাই দেখা যায়। আরজি করে মহিলা ডাক্তারের ধর্ষণ এবং নৃশংসভাবে খুন যা সারা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছে। সারা বিশ্ব জেনে গেছে, একজন মহিলা ডাক্তার কর্মরত অবস্থায় সরকারি হাসপাতালে সেফ জোনে একদল নরপশুর হাতে নির্মমভাবে খুন হয়! শুধু বুঝতে চায় না তৃণমূল সরকারের প্রধান কারিগর।

মানুষ চাইছে অভয়ার ধর্ষণকারী-খুনিদের চিহ্নিত করে দ্রুত তদন্ত শেষ হবে। কোনও রাজনৈতিক রং ছাড়াই। সরকার অপরাধীদের পক্ষ নিয়ে বহু বড়ো বড়ো ল-ইয়ার দিয়েছে হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে। পুলিশি পাহারায় আরজি কর ভাঙচুর যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' সিনেমার রাজার থেকে পশ্চিবঙ্গের প্রধান আরও বেশি ভয়ংকর, নিষ্ঠুর, অত্যাচারী শাসক। সেই পার্ক স্ট্রিট ধর্ষণ কাণ্ড থেকে শুরু করে কামদুনি এবং আজকের অভয়াকাণ্ড, মুখ্যমন্ত্রীকে সমসময় ধর্ষণকারী, খুনিদের পক্ষ অবলম্বন করতে দেখা গেছে।

সরকার যখন তার দায়িত্ববোধ ভুলে যায়, জনগণকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, তখন জনগণ প্রতিবাদে-প্রতিরোধে রাজপথে গর্জে ওঠে। এবারে জনগণের ভাবাবেগ সুনামির মতো আছড়ে পড়ছে। সরকার এতদিন অহংকারে ছিল। অবশ্য তিনি কখনো সত্যি কথা বলেছেন স্মরণ করতে পারি না। জনগণকে ধোঁকা দেওয়া তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। রাজ্যের বিভিন্ন ঘটনাক্রম তার সাক্ষ্য দেয়। অভয়াকাণ্ড উলঙ্গ রাজার মতো তাঁকে উলঙ্গ করে দিলেও তিনি মানতে চান না। রাতে সারা কলকাতা শহর নারীদের দখলে চলে যায়। ভারত থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে সেই প্রতিবাদী আন্দোলনের ঢেউ। ছাত্র, যুবা, বেকার, সকার, নারী, পুরুষ, গ্রাম থেকে শহরে, ভারত থেকে বিশ্বে সর্বত্র এই প্রতিবাদের ঢেউ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। একটাই দাবি— বিচার চাই। সঠিক, নিরপেক্ষ, দ্রুত বিচার চাই। বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। বছরের পর বছর কোনো বিচার প্রক্রিয়া চলতে পারে না। এটা বিচারের নামে অবিচার বলা যায়— জাস্টিস ডিলেড মিনস জাস্টিস ডিনাইড।

আমাকে ভাবায়, সরকার কেন ধর্ষক, খুনিদের বাঁচাতে চাইছে! রাজ্য যদি খুনিদের পক্ষ নেয় সেখানে বিচার পাওয়া দুরূহ হয়। অভয়াকাণ্ডে দেখতে হবে তদন্ত কে আটকাচ্ছেন, তাকে ধরে তদন্ত শুরু করতে হবে, তিনি যত বড়ো ক্ষমতাশালী হোন। বর্তমান ভাবাবেগকে কুর্নিশ জানাতেই হয়। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র যুবা আন্দোলন বাংলাদেশের ধ্বংসাত্মক ছাত্র আন্দোলনের মতো নয়। শান্তিপ্রিয় গণতান্ত্রিক স্বতঃস্ফূর্ত জনগণের আন্দোলন। রং লাগানো আন্দোলন নয়, যদিও সিপিএমের রং লাগানো আন্দোলন বিস্ময় প্রকট করে। কিন্তু কেন? ভোটব্যাংক বাড়বে না। অবশ্য তারা সবসময় সুবিধাগত কৌশল অবলম্বন করে। যেমন স্বপ্নদীপের মৃত্যুতে তারা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসি ক্যামেরা বসানোর বিরুদ্ধে থাকে, আবার আরজি করে কেন সিসি ক্যামেরা নেই বলে প্রশ্ন তোলে। তারা আবার বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের কোটা সংরক্ষণের বিপক্ষে থাকে আবার পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘুদের কোটা সংরক্ষণের পক্ষে থাকে। সিপিএমের এই ভোটকেন্দ্রিক রাজনীতির জন্যে তারা জনগণের থেকে দূরে চলে গিয়েছে। আরও যাবে। জনগণ চায় নবান্ন অভিযান সফল হোক। অভয়ার ধর্ষক-খুনিদের দ্রুত বিচার হোক। স্বৈরাচারী শাসকের নিপাত হোক। রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে আসুক। আশা করি ন্যায় সংহিতার নয়া ধারণায় দ্রুত তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হবে এবং বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত নিষ্পত্তি হবে।

—**সুবল সরদার,**
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

সজ্জন শক্তির সক্রিয়তার প্রয়োজন

সমাজ ভালো লোকে ভরে আছে। সেই ভালো লোক যারা সাতে-পাঁচে থাকে না, কোনো গণ্ডগোল দেখলেই তা এড়িয়ে চলে যায়। কে মরলো, কে বাঁচলো, কারও কোনো ক্ষতি হলো কিনা সে নিয়ে এদের ভাবার সময় নেই। যতই হোক, পরিবারের পিছনে তো সময়টা দিতে হবে নাকি, তার পিছনেই তো সারাটা দিন চলে যায়। কিন্তু যখন বিপদ নিজের উপর আসে তখন পাশে কাউকেই পায় না। পাড়া প্রতিবেশী সকলেই যে আমাদের বড়ো পরিবারের আওতায় পড়ে। অন্যায়কারীরা যে সংখ্যায় খুব বেশি তা নয় কিন্তু তারা জানে ভালো লোকেরা সংগঠিত নয়। তাই হাজারো হাজার লোকের মাঝখান থেকেও অন্যায় করেও বুক চিতিয়ে বেরিয়ে আসে। আর ভালো লোকেরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

ঘটনাচক্রে আজ সেই সজ্জন শক্তির নীরবতা ভেঙেছে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে পথে নেমেছে। সমাজের প্রতি নিজ কর্তব্য একটু একটু করে হলেও পালনে তৎপর হচ্ছে। শিক্ষক-ছাত্র একসঙ্গে হাঁটছে, বাবা-মা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের বাড়িতে আটকে না রেখে প্রতিবাদে শামিল হতে দিচ্ছে, এমনকী নিজেরাও যাচ্ছে। ডাক্তার উকিল কারা নেই? কোনো নেতা ছাড়া, কোনো দলের পতাকা ছাড়াও সমাজ আজ জেগেছে, সমাজের জন্য জেগেছে। সামাজিক মাধ্যমে আটকে না থেকে প্রত্যক্ষ সমাজে প্রকাশ্যে এসেছে। এই জেগে থাকা বড়োই প্রয়োজন। কারণ সমাজ

দুর্জন শক্তির সক্রিয়তার জন্য যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার চেয়েও ক্ষতিগ্রস্ত সজ্জন শক্তির নিষ্ক্রিয়তার জন্য। তাই মনে আশা জাগছে, এই অন্যায়ের সুবিচার হবে।

—নিরঞ্জন দাস,
বালিগঞ্জ, কলকাতা-১৯।

সঠিক মূল্যায়ন প্রয়োজন

গত একমাস ব্যাপী সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জনমানসে এক শোকের আবহাওয়া বর্তমান। একটার পর একটা রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে সামাজিক ঘটনা জনমানসে এক অস্থিরতা তৈরি করেছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন যদিও আন্তর্জাতিক বিষয় কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী হওয়ার জন্যে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যে বেশি আঘাত আসছে। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে বেশ কয়েকদিন বাংলাদেশের হিন্দুদের অবস্থা, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নিয়ে টিভি, সংবাদপত্র, সামাজিক মাধ্যমে সকলেই উদ্বিগ্ন ছিল। সেই রেশের মধ্যেই আরজি কর হাসপাতালে ঘটে যাওয়া নির্মম ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড সকলের মনকে নাড়িয়ে দিয়েছে। আমার এক বয়স্ক কাকিমা এই সমস্ত কথা চিন্তা করে রাত্রে ঘুমাতে পারছেন না। আজ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন বয়সের মানুষের দ্বারা তীব্র আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে অনুসন্ধানের কোনো সঠিক কিনারা হচ্ছে না। কেবলমাত্র রাজনৈতিক চাপানউতোর চলছে। তারও আগে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ডিএ সংক্রান্ত মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গিয়ে ঝুলে আছে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলাও তথৈবচ। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে সরকার, রাজনৈতিক দল, বিচারব্যবস্থা, তদন্ত সংস্থার প্রতি আস্থা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে।

একজন ছাত্রের নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা কমে যাচ্ছে। কে কার কাছে প্রশ্ন করবে, কে উত্তর দেবে এই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশের হিন্দুরা যেমন নিদ্রাহীন, ভবিষ্যৎহীন দিনযাপন করছে, 'অভয়ার মা ও বাবার অবস্থাও সেইরকম। চাকরি প্রার্থী শিক্ষক নিজেই জানে না ২০১৩ সালের প্যানেল অনুযায়ী যোগ্য বা অযোগ্য? এই সমস্ত পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার ও বিচার ব্যবস্থা সবার কাজে বিনীত অনুরোধ, প্রকৃত ঘটনার সঠিক মূল্যায়ন করা যাতে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি ও পরিবার যোগ্য বিচার পায়।

—নয়ন বেরা,
কৌশল্যা, খড়্গপুর, পঃ মেদিনীপুর।

বিরোধী দলের ভূমিকা

দেশে বিরোধী দলের অবশ্যই আবশ্যকতা আছে। এটি আসলে হওয়া উচিত চেকস্ অ্যান্ড ব্যালেন্সের মতো। লেখার সময় বা বলার সময় বলা হয় 'দেশের' বিরোধী দল। দেশের কথা, দেশের সম্মান, দেশের অসম্মান, দেশের মানুষ, দেশের পরম্পরা ও দেশের বৈভবের কথা মাথায় রেখেই আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করতে হয়। এখানে বিরোধী দুই প্রকারের। ১. ইতিবাচক বিরোধী ও ২. নেতিবাচক বিরোধী। ইতিবাচক বিরোধী তারাই যারা জানে পরের নির্বাচনে তারা ক্ষমতায় আসবে। তাই তারা থাকে সংযত। নেতিবাচক বিরোধী তারা যারা জানে মানুষ কখনও তাদের হাতে শাসনভার তুলে দেবে না। তারা হতাশায় ডুবে থাকে। তারা যে ডালে বসে, সেই ডালই তারা কাটে। দেশের ক্ষতি করে আন্দোলন করতে পছন্দ করে। সংসদে এমন কথা বলে যাতে দেশের মান মর্যাদা নষ্ট হয়। অন্য কেউ ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড করলে এই বিরোধীরা তাদের সহযোগিতা করে। সরকার দেশের সম্পদ নষ্টকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে এরাই রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করে। এদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ারও অভিযোগ ওঠে। এরাই অনুপ্রবেশকারীদের মদত দেয়। এদের সক্রিয় মদতে অনুপ্রবেশকারীরা রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড পেয়ে যায়।

লোকসভার লিডার অব অপজিশনকে কেউ কেউ মজা করে বলছেন লিডার অব প্রটেস্ট। আজ সেই বিরোধী দলনেতা দেশের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনেন না। সংসদে দেশের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ চলাকালীন অন্য সাংসদের ওয়ালে নামতে ইশারা করেন। দেশের মানুষ কি তার কাছ থেকে এই আচরণ চায়? দেশের মানুষ একজন দায়িত্বশীল বিরোধী দলনেতা চান।

এছাড়া আরও কিছু বিরোধী আছে যারা রাজ্যেও শাসন ক্ষমতায় আছে। যেমন তৃণমূল। এই দলের স্থায়ী অবস্থান, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতায়। এরা রাজ্যে নৈরাজ্যের পরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছে। এখানে বিভিন্ন স্থানে শরিয়তি শাসন ও অত্যাচার চলছে। দলনেত্রী রোহিঙ্গাদের উপর সর্বদা নরম মনোভাব নিয়ে চলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো কাজ তাঁর পছন্দ নয়। চিন্তা করে কোনো কাজ করে না। রাজ্যে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করে রেখেছেন। নির্বাচন ও নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের হত্যা সমানে করে চলেছে। বিধানসভায় বিরোধী নেতা ও বিধায়কদের বলতে দেওয়া হয় না। এরাই আবার সংসদে অভিযোগ তোলেন, তাদের নাকি বলতে দেওয়া হয় না। এরা পশ্চিমবঙ্গে কখনও বিরোধীদের নিয়ে সহযোগিতার পরিবেশে সরকার চালাতে চায় না। তাই সর্বত্র তোলাবাজি চলছে। সেই কারণেই বিনিয়োগ আসছে না। বিনিয়োগ না এলে চাকরি হবে কোথা থেকে? সারা দেশের জনসংখ্যার ৭ শতাংশের বাস পশ্চিমবঙ্গে। সেখানে বিনিয়োগ মাত্র ০.৭৫ শতাংশ। উন্নয়ন বা কর্মসংস্থান হবে কীভাবে? পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে এবার ভাবতেই হবে। সংসদীয় রাজনীতিতে ইতিবাচক বিরোধী দলের ভূমিকাই কাম্য।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

আমাদের পারম্পরিক পোশাকই স্ব-ভূষা

সুতপা বসাক ভড়

নিজেদের আধুনিক রূপে প্রকাশ করতে আমরা ভালোবাসি। দীর্ঘ কয়েক শতক ধরে বিদেশি শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়ে, আমরা ভুলতে বসেছি আধুনিকতার সঠিক পরিভাষা। আমাদের স্ব (নিজস্বতা) বিস্মৃত হয়ে বিজ্ঞাপন এবং পাশ্চাত্য উচ্ছৃঙ্খলতার জোয়ারে নিজেদের ভাসিয়ে দেওয়াকেই আধুনিকতা মনে করে ফেলেছি। কুফল আমাদের চোখের সামনে। তা সত্ত্বেও উটপাখির মতো বালিতে মাথা ঢুকিয়ে আছি।

পূজা আসছে। মা দুর্গার আবাহনের জন্য আমরা প্রস্তুত হচ্ছি। আমাদের আগেই তৈরি হয়ে আছে বিঘটনকারী শক্তিগুলো। বিশ্বায়নের সুযোগে তারা বাজার দখল করে নিয়েছে। বিজ্ঞাপন তাদের একটি শক্ত মাধ্যম, যার দ্বারা ভিন্ন সম্প্রদায়ের রীতিনীতি, পোশাক ইত্যাদি আমাদের মধ্যে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। বিজ্ঞাপনগুলিতে মহিলাদের বেশভূষা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব, কেশসজ্জায় মাঝখানে সিঁথির পরিবর্তে পাশে সিঁথি। সিঁথির মাঝে টিক্‌লির স্থানে কানের পাশে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত অলংকার জায়গা করে নিচ্ছে। কপালের টিপ অন্তর্ধান হতে শুরু করেছে। 'টিপ' পরা নাকি সেকেলে সাজ। আমাদের পারম্পরিক অলংকারে মিশ্রণ ঘটে চলেছে অনায়াসে। শাড়ি ও সালোয়ার-কামিজের ছাঁট-নক্‌শা, রং ইত্যাদিতে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রভাব জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা আমাদের পারম্পরিক পোশাক থেকে ভিন্ন। পাজামার সীমা মেপে দেওয়া হয়েছে গোড়ালির ওপর। টিভি, মোবাইল সর্বত্র ওই ধরনের পোশাকের বিজ্ঞাপন। চারদিকে পাশ্চাত্যের অর্ধনগ্ন পোশাকের হাতছানি।

বাড়ির পোশাকরূপে অনেক মহিলা শাড়ির পরিবর্তে নাইটি বেছে নিয়েছেন। ওই পোশাক নির্মাণ মূলত একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জীবিকা। ওই পোশাকের পাশের দিকে মাঝামাঝি জায়গায় ছাপা থাকে প্রস্তুতকারী সংস্থার নাম অবশ্যই দ্রষ্টব্য, তাহলে অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে যাবে। এটি আবার বোরখা ও গাউনের মধ্যবর্তী একটি অবস্থা, যা আরামদায়ক হলেও ভদ্র পোশাকের মধ্যে পড়ে না। আমাদের মনে রাখতে হবে, শাড়ি আমাদের পারম্পরিক পোশাক এবং এর অনেক সুবিধাও আছে।

পূজার কেনাকাটা করার সময় আমরা আমাদের পোশাক ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র বাড়িতে আনব। উজ্জ্বল রংগুলি আমাদের পছন্দের। আমাদের পছন্দের হোক স্ব-ভূষা। এমন পোশাক চয়ন করব, যা পরে মাথা উঁচু করে আত্মীয়-স্বজন, সমাজের সামনে আসতে পারি। এক অতি প্রাচীন অথচ চিরনতুন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক আমরা। আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব স্ব-ভূষা, স্ব-সংস্কৃতি ও স্ব-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের দেশের প্রাতস্মরণীয়ারা (অতীত থেকে আজকের মহিলা বৈজ্ঞানিকরা) প্রত্যেকে পারম্পরিক পোশাককেই বেছে নিয়েছেন, ফ্যাশানের ঢেউয়ে কেউ নিজেদের ভাসিয়ে দেননি। পরিবারের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন গৃহকর্ত্রী— সেজন্য কেনাকাটার সময় তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টি সর্বত্র থাকবে— এমনটাই বাঞ্ছনীয়, কারণ 'ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ'। □

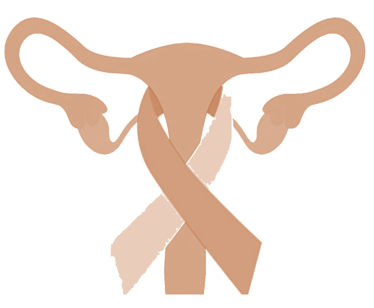

সার্ভিকাল ক্যানসার বা জরায়ু মুখের ক্যানসার

ডাঃ বলরাম পাল

সার্ভিকাল ক্যানসার সম্বন্ধে জানতে গেলে সর্বপ্রথম আমাদের কাছে পরিষ্কার হতে হবে সার্ভিক্স কী। এটি হলো জরায়ুর সবচেয়ে নীচের অংশ এবং যোনির সংযোগস্থল। এই সংযোগস্থলে ক্যানসার হলে তাকে সার্ভিকাল ক্যানসার বলা হয়। এটি মহিলাদের জন্য এক ভয়ানক ব্যাধি এবং বিশ্বব্যাপী নারী মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে সারা বিশ্বে প্রতি দুই মিনিটে একজন নারী জরায়ুমুখ ক্যানসারে মৃত্যুবরণ করেন। সাধারণত জরায়ুমুখ ক্যানসার ১৫-৪৫ বছর বয়সের নারীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়, কিন্তু ক্যানসারের লক্ষণ প্রকাশের প্রায় ২ থেকে ২০ বছর আগেই একজন নারী এ রোগে আক্রান্ত হন। প্রায় সব সার্ভিকাল ক্যানসার সংক্রমণের প্রধান কারণ হলো Human Papilloma Viras (HPV)। সচেতনতার মাধ্যমে প্রাথমিক অবস্থায় যদি এই রোগকে নির্ণয় করা যায় তাহলে এই রোগ প্রতিরোধ করে মৃত্যুহার অনেকটা কমিয়ে ফেলা সম্ভব। মনে রাখতে হবে, এই ভাইরাসের বিভিন্ন রকম স্ট্রেন বা প্রকারভেদ আছে। তবে সব স্ট্রেন থেকে কিন্তু ক্যানসার হয় না। যদিও অল্প সংখ্যক ক্ষেত্রে ভাইরাসটি জরায়ুর কোষে বছরের পর বছর বেঁচে থেকে সার্ভিকাল কোষকে ক্যানসার কোষে রূপান্তরিত করে।

জরায়ু মুখের ক্যানসারের ঝুঁকির কারণ :

১. একাধিক যৌনসঙ্গী থাকলে HPV সংক্রমণ হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ২. যদি ইতিমধ্যেই কোনো যৌন সংক্রামিত রোগ (STD) যেমন গনোরিয়া সিফিলিস HIV/AIDS থেকে থাকে তাহলে HIV সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। ৩. ধূমপায়ী মহিলাদের ক্ষেত্রে এই রোগের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। ৪. যদি কোনো মহিলার অন্য কোনো রোগের কারণে তার নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কমে যায় সেক্ষেত্রে এই ভাইরাসের সংক্রমণ হওয়ার প্রবণতা বাড়ে। ৫. টানা দীর্ঘদিন গর্ভনিরোধক বড়ি সেবন করলে জরায়ু মুখের ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ৬. তিন বা তার অধিক সন্তান ধারণ করলেও এই ক্যানসার হতে পারে।

জরায়ু মুখের ক্যান্সারের প্রাথমিক পর্যায় :

সাধারণত প্রাথমিক পর্যায় বা প্রি ক্যানসার স্টেজে তেমন কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা দেয় না ঠিকই, তবে আবার কিছু ক্ষেত্রে কিছু লক্ষণ ও উপসর্গ লক্ষ্য করা যায় যেমন :

১. জলযুক্ত বা রক্তাক্ত যোনি স্রাব। ২. যোনি স্রাবের দুর্গন্ধ। ৩. যৌন মিলনের পর যোনিপথে রক্তপাত। ৪. দুটি মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে রক্তপাত। ৫. দীর্ঘতর ও অধিক পরিমাণে ঋতুস্রাব হওয়া। ৬. মেনোপজের পরে রক্তপাত। ৭. যৌন মিলনের সময় অস্বস্তি বা তলপেটে ব্যথা।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা : মনে রাখতে হবে, সার্ভিকাল ক্যানসারকে কিন্তু প্রতিরোধ করা যায়। নিয়মিত স্ক্রিনিং, প্রয়োজনে যথাযথ ফলো-আপ ও চিকিৎসার মাধ্যমে জরায়ু মুখের ক্যানসার প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

জরায়ুর মুখ ক্যানসারের স্ক্রিনিং বা বাছাই পদ্ধতি :

সার্ভিকাল ক্যানসারের জন্য প্যাপ স্মিয়ার নামক এক বিশেষ ধরনের স্ক্রিনিং পদ্ধতি আছে। এই পরীক্ষার সাহায্যে সার্ভিক্সের অস্বাভাবিক কোষগুলি ক্যানসারে পরিণত হওয়ার আগে শনাক্ত করা যায়।

ইউরোপ আমেরিকা-সহ উন্নত দেশগুলির মহিলারা নিয়মিতভাবে এই স্ক্রিনিং পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে সেখানে এই ক্যানসারের হার অনেকটাই কমিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা এখনো লজ্জা, ভয়, দ্বিধার কারণে এবং সচেতনতার অভাবে এই জীবন রক্ষাকারী স্ক্রিনিং পদ্ধতির সুযোগ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকি। সার্ভিকাল স্ক্রিনিং বা প্যাপ স্মিয়ার পরীক্ষার মাধ্যমে যেমন ক্যানসারের প্রাথমিক অবস্থাকে নির্ণয় করা যায়, ঠিক তেমনি বর্তমান আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় এইচপিভি ভাইরাসের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে টিকাকরণ ব্যবস্থাও করা যায়।

আমাদের দেশে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের ১৬ ও ১৮ এই দুটি স্ট্রেন জরায়ু মুখ ক্যানসারের জন্য দায়ী। এই দুই প্রকার ভাইরাসকে প্রতিরোধ করার জন্য গার্ডাশিল এবং সারভেরিক্স বা বি-ভালেন্ট নামক দুটি ভ্যাকসিনের মধ্যে যে কোনও একটি নিলেই কার্যকর ফল পাওয়া যায়।

কারা ভ্যাকসিন নিতে পারবেন না :

- গর্ভাবস্থায় এই ভ্যাকসিন নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় না।
- যাঁরা 'ল্যাকটেটিং মাদার' বা যে মায়েরা সন্তানকে বুকের দুধ পান করান তাঁদেরও এই ভ্যাকসিন থেকে দূরে থাকতে হবে।
- যাঁদের অ্যালার্জির সমস্যা, ভারী অসুখ কিংবা বন্ধ্যত্বের সমস্যা রয়েছে তাঁদের এই ভ্যাকসিন নেওয়ার আগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
- জ্বর, সর্দি বা অন্য কোনোওরকম শরীর খারাপের সময় এই ভ্যাকসিন না নেওয়াই ভালো। □

অযোগ্যরা ক্লাসরুমে, আর যোগ্যরা রাস্তায়। এর বিপরীতটা ঘটাতেই হবে রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে।

‘ছুটিয়াছে অমোঘ নিয়তির টানে’

ড. পঙ্কজ কুমার রায়

সারস্বত সাধনার প্রাণকেন্দ্র ছিল পশ্চিমবঙ্গ। দেশভাগের পর ১৯৪৮ সালে শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল প্রথম। আর আজ তালিকার নীচের দিকে খুঁজে দেখতে হয়। সারা ভারত থেকে শিক্ষার্থী একদিন এরাজ্যে আসত বিদ্যার অন্বেষণে। মা সরস্বতীর আরাধনায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই রাজ্যে ছুটে আসতেন, কেউ কেউ এই রাজ্য থেকে ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়তেন। কিন্তু আজ বাঙ্গালির অর্থনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতি বর্তমানে এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাম আমলের শিক্ষার অবনমন আজও অব্যাহত। প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়া, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথার বিলোপ, সাক্ষরতার নামে অর্থের অপচয়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিলায়ন, প্রাথমিক থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত দলের লোকদের প্রাধান্য, আধুনিক শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া--- বাম আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার কিছু বহিঃপ্রকাশ। ৩৪ বছরের বাম শাসনে শিক্ষকদের বেতন বাড়লেও সম্মানহানির কথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শোনা যাচ্ছিল।

রাজনীতিমুক্ত শিক্ষার ডাক দিয়ে ক্ষমতায় এসে ‘বদলা নয়, বদল চাই’— স্লোগানের আড়ালে মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষাক্ষেত্র দখল করতে নেমে পড়েন। শিক্ষা আইনের পরিবর্তন করে স্কুল-কলেজে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের রমরমা, ওয়েবকুপার দাপাদাপি, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উচ্চ-মাধ্যমিক সংসদ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কোর্ট-কাউন্সিল বা সেনেট-সিন্ডিকেটে নির্বাচিত সদস্যের পরিবর্তে মনোনীত সদস্য বসানো রীতিতে পরিণত হয়েছে। ২০১৭ সালে ছাত্র-সংসদ নির্বাচন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অলিখিত ছাত্র-সংসদ প্রায় সব কলেজেই চলছে, এমনকী পরিচালন সমিতিতে মনোনীত ছাত্র-প্রতিনিধি রাজ্যের শাসক দলের প্রতিনিধিত্বের ধ্বজা উড়িয়ে চলেছে। ছাত্র-ছাত্রী ভর্তিতে কাটমানি থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগে অর্থই একমাত্র মাপকাঠিতে পরিণত হয়েছে। প্রাইমারি থেকে স্কুল, স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ‘সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে’। হয় অর্থ দাও, না হয় দল করো— যোগ্যতার কোনো প্রয়োজন নেই।

ভারতের ইতিহাসে তো নয়ই, পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও এমন উদাহরণ দেখা যায়নি সাম্প্রতিক অতীতে যার সাক্ষী থেকেছে পশ্চিমবঙ্গ। ২০১৪ থেকে ২০২১ পর্যন্ত রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তার বান্ধবী অর্পিতা-সহ জেলে ঢুকেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য (যিনি আবার আগে পিএইচডি, পরে মাস্টার ডিগ্রি), ইডি-র ভাষায় তিনি দুর্নীতির নতুন সংজ্ঞা সৃষ্টি করেছেন। স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সুবীরেশ ভট্টাচার্য দুর্নীতিতে জেলে (বিচারক তাকে ৭ বছর জেলে থাকতে বলেছেন, তারপর অ্যাপিলে যেতে বলেছেন)। স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিনহার ১৩৬ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছে, পার্থ-অর্পিতার দশটি সম্পত্তি ইডি অ্যাটাচ করেছে। এছাড়াও এককালে পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রসন্ন রায়, কুন্তল ঘোষ, শান্তনু ব্যানার্জি, চন্দন মণ্ডল, অয়ন শীল, সুজয় ভদ্ররা প্রাইমারি ও এসএসসি দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার হয়ে এখন উচ্ছিষ্ট খেয়ে জেলে জীবন অতিবাহিত করছে।

২০১২ সালের ৩১ মার্চে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোষিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা

ছিল ৭৪,৭১৭টি। এই সরকার ১০ বছর চলার পর ২০২২ সালের ৩১ মার্চ এই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৬৭,৬৯৯টি। অর্থাৎ, গত দশ বছরে জনসংখ্যা ২ শতাংশের চেয়ে বেশি হারে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ৭,০০০-এর বেশি প্রাথমিক স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। রাজ্যে মোট প্রাথমিক-মাধ্যমিক স্কুল বন্ধ হয়েছে ৮,২০৭টি, যার ছাত্রসংখ্যা ৩০-এর কম। উচ্চ-মাধ্যমিকে ছাত্রসংখ্যা এই দশ বছরে ৯,২৩,০৪৫ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৭,৫৫,৩২৪। প্রশ্ন হচ্ছে, বিদ্যালয়গুলিতে বিল্ডিং, শৌচাগার, পানীয় জলের সুবিধা, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা, শিক্ষার উপকরণ, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পোশাক ও জুতো প্রদান, তাদের দুপুরের খাবার (যার গুণমান ও পরিমাণ আবার বির্তকের কেন্দ্রবিন্দুতে), সবুজ সাথী, বিশ্বস্বীকৃত কন্যাশ্রী থাকা সত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা কেন সরকারি স্কুল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন?

শিক্ষার প্রধান চালিকাশক্তি হলো ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় তাদের মিলন ক্ষেত্র। 'বিদ্যা সহজ, শিক্ষা কঠিন। 'বিদ্যা আবরণে, শিক্ষা আচরণে'— রবীন্দ্রনাথের এই বাণী বার বার মনে পড়ে। এই রাজ্যে শিক্ষা সম্পর্কে অনীহার মূল কারণ শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান বাতাবরণ, শিক্ষাব্যবস্থায় স্বচ্ছতার অভাব এবং আধুনিকতা-বিমুখ পাঠ্যসূচি। শিক্ষাক্ষেত্র আস্ফালনের স্থান নয়; প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাদানের উপযুক্ত ও সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি না করে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে রসাতলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্যোধনের অধঃপতন দেখে ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল— 'আপনি দুর্যোধনকে বিরত করছেন না কেন?' উত্তরে (রবীন্দ্রনাথের ভাষ্যে) ধৃতরাষ্ট্র বলেছিলেন— 'ছুটিয়াছে অমোঘ নিয়তির টানে দুর্নিবার আকর্ষণে'।

মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় মুখ্যমন্ত্রীরই একদা সহপাঠী মানিক ভট্টাচার্য প্রাথমিকে নিয়োগে অভিনব দুর্নীতি করেছেন। শুধু অর্থের বিনিময়ে প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বিক্রি করেননি, পরীক্ষার ও.এম.আর. শিটগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করেছেন, এমনকী শিটগুলির স্ক্যান কপিও সংরক্ষণ করেননি। ফাঁকা খাতায় পরীক্ষা দেওয়া প্রার্থীদের চাকরি দিয়েছেন। মেধা তালিকা লঙ্ঘন করে চাকরি দিয়েছেন। স্বজনপোষণ, দলতন্ত্রের আঁতুড়ঘরে পরিণত করেছেন প্রাথমিক শিক্ষা সংসদকে। আগামীদিনে প্রাথমিকে চাকরি বাতিলের সম্ভাবনা প্রায় ৩২,০০০। ২০১৪ সালের প্রাইমারি টেট পরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৬ সালে ৪২,০০০ শিক্ষক নিয়োগ হয়। প্রশিক্ষিত প্রার্থীদের বাদ দিয়ে, এনসিইআরটি-র নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে প্রশিক্ষণহীন প্রার্থীদের নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে সংরক্ষণের নিয়মও মানা হয়নি, অ্যাপটিচিউড টেস্ট নেওয়া হয়নি, কিন্তু নম্বর দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষায় ফাঁকা খাতা জমা দেওয়া লোকজনকে চাকরি দেওয়া সত্যিই মানিক ভট্টাচার্যের মাথা থেকে বেরনো এক অসাধারণ উদ্ভাবনী কৌশল। সর্বোপরি র‍্যাঙ্ক জাম্প করিয়ে মেধা তালিকার নীচের প্রার্থীকে চাকরি দেওয়া, যোগ্যদের বার বার বঞ্চিত করা এক প্রকৌশলে পরিণত হয়েছে 'মা-মাটি-মানুষে'র সরকারের দৌলতে।

নিয়মিত এসএসসি পরীক্ষা নেওয়ার চল এই রাজ্যে উঠে গিয়েছে। এসএসসি এবং প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ হয়ে উঠেছে দুর্নীতির এক-একটি আখড়া। স্কুলগুলিতে যাদের নিয়োগ করা হয়েছে তাদের একটা বড়ো অংশ অযোগ্য। এই সব কিছুর পরিণামে শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যালয়-বিমুখ। স্কুলগুলিতে কর্মসংস্থানের অভাবে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা এই রাজ্যে দিন দিন বাড়ছে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে উচ্চ-প্রাথমিক, নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগ, স্কুলগুলিতে গ্রুপ-সি ও গ্রুপ ডি কর্মচারী নিয়োগের বৈধতার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য হলো— 'কেস অফ সিস্টেমিক ফ্রড'। এক্ষেত্রে সব মিলিয়ে ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি প্রশ্নের মুখে।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি.ওয়াই. চন্দ্রচূড়ের পর্যবেক্ষণ— 'It was your duty as SSC to keep mirror digital copies of the sheet? We did not expect you to keep OMR copies but digital copies in this age. You are unaware that the service provider put a sub-contract under your supervisory control.' ফলে appointment 'arbitrarily' হয়েছে বলে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির অভিমত।

শিক্ষার এই শ্মশানযাত্রায় বঙ্গীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। পশ্চিমবঙ্গকে ঘুরে দাঁড়াতে হলে একমাত্র উপায়— ''শিশুঘাতী, নারীঘাতী কুৎসিত বীভৎসা-'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন নিত্যকাল রবে''। আরজি করে চিকিৎসক ছাত্রীর খুন চূড়ান্ত সম্মানহানি অন্তর্নিহিত কারণ হলো এই রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ ব্যবস্থারই সম্মানহানি করা হয়েছে। এটা শিক্ষার অনাচার নয়, শিক্ষার 'অন্তর্জলি যাত্রা'। এখনও যারা এই সরকারের জয়গানে মুখর, তাদের মনে রাখতে হবে যে আজ গণিকারা দুর্গাপূজার প্রতিমা তৈরির মৃত্তিকা দিতে অস্বীকার করছেন। আর অনুপ্রাণিত, তথাকথিত পরজীবীরা নিজেদের এত নীচে নামিয়েছেন যে বর্বরোচিত ঘটনাতেও তাদের হৃদয় কাঁদেনি, ব্যথিত হয়নি। এ এক চরম লজ্জা!

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা সংস্কৃতি ও কৃষ্টি রক্ষায় আপামর রাজ্যবাসীকে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। না হলে ভাবীকাল প্রশ্ন করবে, এরা মানুষ ছিল কি? দুর্বৃত্তদের কারণে সমাজ ও দেশ পিছিয়ে পড়ে না; সমাজ এই কারণে পিছিয়ে পড়ে, যারা প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা রাখে তারা চুপ করে থাকে বলে। বিগত শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ একক প্রতিবাদী হয়েছিলেন। এই শতাব্দীতে কোনো রবীন্দ্রনাথ নেই। তাই আমাদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরে 'কণ্ঠরোধ'কে প্রতিহত করতে পারবে। শেখানো আমাদের পেশা, তবুও কিছুতেই শেখে না যারা, তাদেরই শেখাতে পথের ধুলায় আমাদেরই দাঁড়াতে হবে। অযোগ্যরা ক্লাসরুমে, আর যোগ্যরা রাস্তায়। এর বিপরীতটা ঘটাতেই হবে রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে। তবেই শিক্ষা ব্যবস্থার রাহুমুক্তি ঘটবে।

(লেখক অধ্যক্ষ, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ)

জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে সংস্কার ভারতীর ‘কৃষ্ণ সাজো’ প্রতিযোগিতা

খুদে কৃষ্ণরাও নারী নির্যাতনের বিচার চায়। খুদে কৃষ্ণদের এই দাবি নিয়ে গত ২৬ আগস্ট জন্মাষ্টমীর দিন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় শিশুদের ‘কৃষ্ণ সাজো’ আয়োজন করে দক্ষিণবঙ্গ সংস্কার ভারতী। তবে সেই কৃষ্ণ ব্রজের নন। তিনি ‘নারীর সম্ভ্রম রক্ষাকারী শ্রীকৃষ্ণ’। তিনি কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ। যে কৃষ্ণের এক হাতে সুদর্শন চক্র এবং অন্য হাতে পাঞ্চজন্য শঙ্খ। সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমিতি তাদের পরিকল্পনা মতো গত ২৬ আগস্ট কলকাতা-সহ সব জেলায় ‘শ্রীকৃষ্ণ রূপসজ্জা’ প্রদর্শনের মাধ্যমে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে শামিল হয়। রাজ্যের ১২টি জেলার ৪২টি চর্চাকেন্দ্রে মোট একহাজার শিশু এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতি বছরের মতো এবারও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বয়সি শিশুদের নিয়ে ‘কৃষ্ণ সাজো’ প্রতিযোগিতা দেখতে সবার মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

এই কর্মসূচিতে কোথাও সংগঠনের উদ্যোগে মন্দির প্রাঙ্গণে ছোটোদের কৃষ্ণ সাজিয়ে, কোথাও আবার সেই ছোটো ছোটো কৃষ্ণদের নিয়ে শোভাযাত্রা করা হয়। খুদে কৃষ্ণদের দেখতে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। খুদে কৃষ্ণদের মধ্যে কেউ বংশীধারী, কেউ সুদর্শনধারী, কেউ-বা রাখালরাজা, ননীচোরা থেকে বালগোপাল। এমনকী কালীয়নাগ দমনকারী কৃষ্ণ সাজে শিশুদের ভূমিকা উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কৃষ্ণের নানা উক্তি, ভাবভঙ্গিমায় শিশুদের মধ্যে কৃষ্ণের নানারূপ দেখে আনন্দিত উদ্যোক্তা থেকে অভিভাবকরা, আর কৃষ্ণ সেজে তাঁর রূপ উপস্থাপন করতে পেরে খুশি শিশুরাও। প্রতিযোগিতায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন মতাবলম্বী অভিভাবকরা তাঁদের শিশুদের শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীভুক্ত পরিবার থেকে তাঁদের শিশুকে শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়ে আনার সঙ্গে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, সচ্ছল পরিবারগুলি থেকেও বহু শিশু এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে’ এবং ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’ লেখা পোস্টার হাতে ছিল খুদে কৃষ্ণদের।

খুদে শিশুদের বাবা-মায়েদের দাবি, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় বংশীধারী, সুদর্শনধারী হয়ে তিনি প্রকাশিত হন আমাদের হৃদয়ে। তবে এবার কিন্তু খুদে কৃষ্ণরাও প্রতিবাদে শামিল। খুদে শিশুদের অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের নিয়ে প্রতিবাদে শামিল হলেন। কেন এই উদ্যোগ? এই প্রশ্নে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত বলেন— ‘শুধু ‘বিচার’ চাওয়ার জন্য এই উদ্যোগ নয়। মহিলাদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে সাধারণ মানুষের আন্দোলনে শ্রীভগবানের শক্তিরই প্রয়োজন। কারণ, মহাভারতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের চেষ্টা করা হলে তিনিই সহায় হয়েছিলেন। এখন নারীর সম্ভ্রমরক্ষার জন্য চাই সংহারকারী, চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণকেই’’। সংগঠনের দাবি, এখন যে পরিস্থিতি, তাতে রাধাকান্ত কৃষ্ণ নন, প্রয়োজন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনকে পথ দেখানো শ্রীকৃষ্ণের।

নিজের সন্তানকে কৃষ্ণ সাজিয়ে নিয়ে এসেছিলেন গৃহবধূ মানালি বিশ্বাস। তিনি বলেন, ‘ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সত্যের পথে থাকার যে শিক্ষা দিয়েছেন, তা যাতে আমার সন্তানের মধ্যে প্রকাশ পায় তাই আমি ওকে কৃষ্ণ সাজিয়ে এনেছি। আমিও চেয়েছি আমার শিশুও প্রতিবাদে শামিল হোক, তাই পথে নেমেছি’। সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন— ‘‘আমরা জানি, ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতার রূপে শ্রীভগবান আসেন। সেই ‘সম্ভবামি যুগে যুগে’ মন্ত্র নিয়েই আমরা ধর্ম স্থাপনার আন্দোলন চাই। যা হলে নারীর উপরে নির্যাতন, নারীর অসম্মান বন্ধ হবে’’।

বিশ্ব হিন্দু বার্তা পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ৬০ বছর পূর্তি সমাপন অনুষ্ঠান

গত ২৪ আগস্ট, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মুখপত্র 'বিশ্ব হিন্দু বার্তা' মাসিক পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গৌরবময় ৬০ বছর পূর্তি সমারোহ সমাপন উপলক্ষ্যে কলকাতায় ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভাষা ভবনের প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত হয় একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রিষড়া প্রেম মন্দির আশ্রমের শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ, কর্ণাটক হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদা প্রসাদ পাল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সম্পাদক, অখিল ভারতীয় সহ-সেবা প্রমুখ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের পালক স্বপন কুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি ও বিশিষ্ট আইনজীবী সুবীর সান্যাল, প্রান্তের কার্যকরী সভাপতি অজয় গোয়েল, প্রান্ত সহ-সভাপতি ও বিশ্ব হিন্দু বার্তার পালক দিলীপ ঝাঁওয়ার, প্রান্ত সম্পাদক চন্দ্রনাথ দাস, বিশিষ্ট শিল্পপতি এবং বিশ্ব হিন্দু বার্তা পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব কমিটির আহ্বায়ক অরুণ চুড়িওয়াল, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতার ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা ড. প্রগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, আইআইটি-খড়্গপুরের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. সুমন চক্রবর্তী, কলকাতার ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজের গণিত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. শুভ্রজ্যোতি দেবনাথ, বিশিষ্ট শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী নিবেদন চুড়িওয়াল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক মানিক চন্দ্র পাল এবং বিশ্ব হিন্দু বার্তার সহ-সম্পাদক সৌগত বসু। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. সুরেন্দ্র জৈন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অরুণ চুড়িওয়াল।

দীপ প্রজ্বলন মন্ত্রের মাধ্যমে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা ভারতমাতা ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য ও মাল্যদান করেন। ওঙ্কার ধ্বনি ও বিজয় মহামন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রথমে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে নিহত ডাক্তার ছাত্রীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরব প্রার্থনা করা হয়। তারপর হয় বিশিষ্ট অতিথিদের বরণ পর্ব। অতিথিদের পরিচয় তুলে ধরেন অনুষ্ঠানের সঞ্চালক বিশ্ব হিন্দু বার্তার সম্পাদক ড. জয়ন্ত বিশ্বাস। এরপর প্রান্ত সহ-সভাপতি দিলীপ ঝাঁওয়ার বিশ্ব হিন্দু বার্তার সম্পাদকমণ্ডলী, এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত লেখক-লেখিকা, পত্রিকার প্রচার-প্রসারের সঙ্গে যুক্তদের সঙ্গে উপস্থিত সকলের পরিচয় করিয়ে দেন এবং উত্তরীয় পরিয়ে তাঁদের সম্মান জ্ঞাপন করেন। ১৪৩০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে বার্তার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণের শুরু থেকে গোটা বছর ধরে প্রকাশিত ১২টি সংখ্যার প্রচ্ছদ ও বিষয় ভাবনাসমূহ প্রেক্ষাগৃহের পর্দায় উপস্থাপিত হয়। এরপর সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ সমাপনের সঙ্গে বার্তার প্রথম সংখ্যা (ভাদ্র, ১৪৩১)-র উন্মোচন করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা। এই সংখ্যার বিষয় ভাবনা হলো— জন্মাষ্টমী, ঝুলন যাত্রা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ইতিবৃত্তান্ত, স্বাধীনতা দিবস ও বিবিধ।

তাঁর সভাপতির ভাষণে অরুণ চুড়িওয়ালজী বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বিশ্ব হিন্দু বার্তার ইতিহাস তুলে ধরেন। আধুনিক ভারতে দেশ, ধর্ম, সমাজ, সংস্কার ও সংস্কৃতি রক্ষায় বিশ্ব হিন্দু বার্তা পত্রিকার অবদান তিনি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সাম্প্রতিক অবক্ষয়, মূল্যবোধহীনতা, মা-বোনেদের উপর নির্যাতন, সংস্কারহীনতা, সন্তসমাজের উপর নেমে আসা আক্রমণ এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতির বাড়বাড়ন্তের বিপদের কথা তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন পূজনীয় নির্গুণানন্দজী মহারাজ। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দেশবিরোধী শক্তিগুলি সম্পর্কে মহারাজের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় সতর্কবাণী। ধর্ম রক্ষায়, সমাজ গঠনে এবং অবক্ষয় রোধে আপামর হিন্দুসমাজের ঐক্যবিধানের প্রয়োজনীয়তা কথা স্মরণ করিয়ে দেন মহারাজ।

হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজ বর্তমানে যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, দৃঢ়ভাবে তার মোকাবিলা করে আগামীদিনে পরম বৈভবশালী রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে সংকল্প গ্রহণের কথা তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সম্পাদক স্বপন কুমার মুখোপাধ্যায়। 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' স্থাপনার ইতিহাস এবং এই সংস্থার বিভিন্ন বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে কাজ করে চলেছে, পরিষদের তত্ত্বাবধানে যে

প্রকল্পগুলি সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে ভবিষ্যতে এই রাজ্যে সংস্থার কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সকলের যোগদান ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি তুলে ধরেন। এরপর বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ড. সুরেন্দ্র জৈন। তাঁর বক্তব্যে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হয় আধুনিক বিশ্বে ভারতের অবস্থান, দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে চলা নানা বিপদ এবং শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দের চরণবিধৌত পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে জেহাদিদের দৌরাত্ম্য, তাদের দ্বারা সংঘটিত সন্ত্রাস ও অপরাধ, সীমান্ত জেলাগুলি দিয়ে ব্যাপক অনুপ্রবেশ, হিন্দুদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতাহীনতা, আর এই সব কিছুর পিছনে রাজ্য সরকার ও স্থানীয় শাসক দলের প্রত্যক্ষ মদত এই রাজ্যের পরিস্থিতি শোচনীয় করে তুলছে, জন্ম দিচ্ছে অসংখ্য মিনি পাকিস্তান— এই বিষয়গুলি তাঁর বক্তব্যে উপস্থাপিত হয়। সাম্প্রতিক আরজি করের ঘটনাটি থেকে শুরু করে রাজ্যজুড়ে নারী নির্যাতন এবং এই রাজ্যে হিন্দু সমাজের উপর যে আক্রমণ নেমে আসছে সেই বিষয়ে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এর সর্বাত্মক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে হিন্দুসমাজের সার্বিক জাগরণের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

এরপর অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন চন্দ্রনাথ দাস। সংগঠন মন্ত্র ও শান্তি মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

‘সক্ষম’-এর রক্তদান শিবির ও রক্ষাবন্ধন

গত ২০ আগস্ট বারাসাত নগরে ‘সক্ষম’-এর উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে স্থানীয় স্বয়ংসেবকরা রক্তদান করেন। এছাড়া প্রতীকী রক্ষাবন্ধন উদ্‌যাপনের সঙ্গে বৃক্ষচারা বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সমাজসেবী সমরেন্দ্র দাস-সহ বহু বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। সক্ষমের প্রদেশের অন্যতম সহ-সভাপতি চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ তরুণ সরকার সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ সনৎ কুমার রায় এবং সম্পাদক অনীক বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। গত ২৪ আগস্ট, বিধাননগরের উত্তরায়ণ ডে কেয়ার দিব্যাঙ্গজন বিদ্যালয় এবং কেষ্টপুরে স্বস্ত্যয়ন দিব্যাঙ্গজন বিদ্যালয়ে রক্ষাবন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৪৬ জন ছাত্র-ছাত্রী উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এই কার্যক্রমে সক্ষম-এর কার্যকর্তাদের সঙ্গে প্রধান অতিথি হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক প্রশান্ত ভট্ট উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সক্ষম-এর পক্ষ থেকে হাওড়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় রক্ষাবন্ধন পালন করা হয়েছে।

মথুরাবাটি বিবেকানন্দ সেবা সমিতির উদ্যোগে কৃষ্ণ সাজে শোভাযাত্রা

হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া ব্লকের মথুরাবাটি গ্রামে জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে মথুরাবাটি বিবেকানন্দ সেবা সমিতির উদ্যাগে কৃষ্ণ সাজে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।। শোভাযাত্রায় গ্রামের ১১৩ জন ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়ে কৃষ্ণ সাজে অংশগ্রহণ করে। শোভাযাত্রা চলাকালীন গ্রামের মা-বোনেরা উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করে তাদের স্বাগত জানায়।

ফ: ৪

অজানা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণে অনুষ্ঠান

গত ২৪ আগস্ট, ভারতের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কলকাতা প্রেস ক্লাবের মেন হলে আত্মপ্রকাশ করলো অজানা, অজ্ঞাত বিপ্লবীদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের একটি সংগঠন— 'আনজানে আজাদি : অ্যান আনটোল্ড স্টোরি'। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর পৌত্র সুব্রত চাকী, বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের পৌত্র কৌশিক দত্তগুপ্ত এবং বিপ্লবী দেবেশ চন্দ্র কুণ্ডুর পৌত্র সুবীর কুমার কুণ্ডু। অনুষ্ঠানের শুরুতে আরজি করের ডাক্তার ছাত্রীকে খুনের প্রতিবাদে ১ মিনিট নীরব প্রার্থনা করা হয়। তারপর উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিপ্লবী হৃষিকেশ চক্রবর্তী ও ব্যোমকেশ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্টজন। বিপ্লব রায় এদিন বিপ্লবীদের স্মারক সংগ্রহশালা— 'রিসার্চ ইনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়ান ফ্রিডম মুভমেন্ট' গড়ার কথা তুলে ধরেন। কলকাতার বুকে 'স্বাধীনতা পার্ক' নামে একটি পার্ক গড়ার ব্যাপারে কলকাতার মেয়রের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে বলে তিনি জানান। বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর নাতি তথা এই সংগঠনের মূল উদ্যোক্তা সুব্রত চাকীও এই অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্য রাখেন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের পরিবারের তানি মুখোপাধ্যায় এবং বিপ্লবী পরীক্ষিত মুখোপাধ্যায়ের নাতি অমল মুখোপাধ্যায় সংগীত পরিবেশন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিপ্লবী দেবেশ চন্দ্র কুণ্ডুর নাতি সুবীর কুমার কুণ্ডু। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের

চক্রবর্তীর পরিবারের মিঠু চক্রবর্তী। ভারতমাতার ছবিতে মাল্যার্পণ করেন বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী পরিবারের তন্দ্রা চাকী। এরপর বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর পরিবারের সৌরদীপ রায় 'বন্দে মাতরম্' গানটি গেয়ে শোনান। বিপ্লবী নরেন্দ্র কুমার বক্সির নাতি শোভনলাল বক্সি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' থেকে পাঠ করেন। তারপর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নাতি প্রসাদরঞ্জন দাশ আবৃত্তি ও সংগীত পরিবেশন করেন। রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের নাতির পুত্র নীললোহিত। অনুষ্ঠানে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন গবেষক ও বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জীবনী লেখক সায়ন্তন বসু, প্রাক্তন বিচারক এবং বর্তমানে ভারতে ইউনেস্কোর অফিসিয়াল পার্টনার ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ আর্টের গুডউইল অ্যাম্বাসাডার বিপ্লব রায়, সুখবর পত্রিকার সম্পাদক শমীক স্বপন সশস্ত্র বিপ্লবে যোগদান করে যে সমস্ত বিপ্লবী আত্মবলিদান করেছেন, সেই বিপ্লবীদের আত্মীয়-পরিজনেরা ও আনজানে আজাদি সংগঠনের সদস্যরা এই অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাওয়া বিপ্লবীদের স্মৃতিকে জনসমক্ষে পুনঃপ্রতিষ্ঠার করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণের শপথ নিলেন। তাঁরা এখন থেকে নিয়মিতভাবে মিলিত হবেন এবং ইতিহাসে উপেক্ষিত বিপ্লবীদের আত্মবলিদানকে স্মরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাবেন বলেও তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন সৌরদীপ রায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্তদের পরিবারের প্রায় ৩০০ জন সদস্য এই অনুষ্ঠানে এসে তাঁদের পূর্বসূরীদের কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে সম্মান জ্ঞাপন করেন।

ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের উদ্যোগে হাওড়ায় রক্তদান শিবির

হাওড়া জেলায় শিবপুর বি.ই. কলেজে (বর্তমানে আই.আই.ই.এস.টি.) ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ (বিএমএস) অনুমোদিত কর্মচারী সংগঠনের উদ্যোগে গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এবারের ৫ম রক্তদান শিবিরে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী ও ছাত্র রক্তদান করেন। বি.ই কলেজের অধিকর্তা প্রফেসর ভি.এম.এস.আর. মূর্তি ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। শিবিরে ৭৮ জন রক্তদান করেন। রক্ত সংগ্রহ করে চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতাল। বিএমএসের পক্ষ থেকে হাওড়া জেলা প্রভারী সুরেন্দ্র যাদব এবং জেলা কনভেনর প্রতাপ সিংহ এই শিবিরে উপস্থিত থেকে সকলকে উৎসাহিত করেন।

স্বাস্থ্য সচেতনতার লক্ষ্যে আরোগ্য ভারতীর কর্মশালা

গত ২৫ আগস্ট আরোগ্য ভারতী, কলকাতা মহানগরের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগের পক্ষ থেকে বেহালা রবীন্দ্র নগর বাস স্ট্যান্ডের

কাছে ত্রিশক্তি ভবনে আয়োজিত হয় একটি 'স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মশালা'। ৬০ জনপ্রতিনিধি এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। দুপুর তিনটে থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত এই কর্মশালা চলে। এই কর্মশালায় আলোচিত বিষয় ছিল— যোগ, খাদ্যাভ্যাস, আয়ুর্বেদ, বনৌষধি ও নেশামুক্তি। কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষকে সার্বিকভাবে স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলা। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন আরোগ্য ভারতীর পূর্বক্ষেত্র সচিব বুদ্ধদেব মণ্ডল, আরোগ্য ভারতী, দক্ষিণবঙ্গের সভাপতি ড. অভিজিৎ ঘোষ, সহ-সভাপতি জয়ন্ত সেন, আরোগ্য ভারতী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বনৌষধি প্রচার-প্রসার প্রমুখ অঙ্কিতা শূর এবং আরোগ্য ভারতী, কলকাতা মহানগরের অধ্যক্ষা শর্মিষ্ঠা বিশ্বাস।

বালুরঘাটে বীর চুড়কা মুর্মু বলিদান দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৮ আগস্ট দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের অনতিদূরে চকরামপ্রসাদ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বীর চুড়কা মুর্মু বলিদান দিবস বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে পালিত হয়। সকালে চুড়কা মুর্মু স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগে একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৬৫ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় পর্বে স্থানীয় বালক-যুবকদের কবাডি প্রতিযোগিতা, তিরন্দাজি, মোরগ লড়াই ইত্যাদি খেলার আয়োজন করা হয়। চুড়কা

মুর্মুর সমাধিস্থলে এবং স্মারক বেদীতে পুষ্পার্পণ করেন জেলা সঙ্ঘচালক রবিকান্ত বর্মণ-সহ স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তারা। বালুরঘাটের স্বয়ংসেবক তথা সাংসদ ড. সুকান্ত মজুমদার কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন।

সংস্কৃত ভারতীর কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ

গত ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, দু'দিনের সংস্কৃত ভারতীর দক্ষিণবঙ্গের কার্যকর্তাদের বিকাশ বর্গ অনুষ্ঠিত হলো কলকাতার মানিকতলাস্থিত কল্যাণ ভবনে। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয়-সহ প্রশিক্ষণ প্রমুখ ডাঃ সচীন কঠালে, সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক প্রশান্ত ভট্ট, ক্ষেত্র সংগঠন মন্ত্রী প্রণব নন্দ, দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত অধ্যক্ষ ডাঃ তন্ময় ভট্টাচার্য। প্রান্তের ১১টি জেলা থেকে কার্যকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

স্বর্গীয় কালাচাঁদ কুণ্ডুর আত্মার শান্তি কামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান

গাজলের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী স্বর্গীয় কালাচাঁদ কুণ্ডু হিন্দু সংগঠনের বিশেষ স্তম্ভ হিসেবে মালদায় পরিচিত ছিলেন। গত ২৩ আষাঢ় প্রায় ৯৩ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তার সুযোগ্য পুত্র কাজল কুণ্ডু স্বর্গীয় পিতার কর্মযোগকে স্মরণে রেখে গাজলের নিজ গৃহে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। মালদা, দিনাজপুরের সমস্ত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের ডেকে যজ্ঞ ও পূজাপাঠ করান। সঙ্গে সঙ্ঘ বিচার পরিবারের প্রচারক ও পূর্ণকালীন কার্যকর্তাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে সন্ত ও প্রচারকদের মাল্যদান ও বস্ত্র প্রদান করেন।

বহরমপুরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্থাপনা দিবস উদ্‌যাপন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ৬০তম স্থাপনা দিবস উপলক্ষ্যে সারা দেশের সঙ্গে মধ্যবঙ্গের দুই সাংগঠনিক জেলা ব্রহ্মপুর ও রঘুনাথগঞ্জের বিভিন্ন প্রখণ্ডে উৎসাহের সঙ্গে উৎসব পালিত হয়। ২৬ আগস্ট বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বহরমপুর জেলা কার্যালয়ে দিনভর উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে ষষ্ঠী পূর্তি কার্যক্রম পালিত হয়। সকালে শ্রীকৃষ্ণের পূজা, বিকেলে শিশু-বালকদের তিন ভাগে অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়। পরে মায়েদের শঙ্খধ্বনি প্রতিযোগিতা, শিশুদের কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা হয়। সন্ধ্যায় পরিষদ সভাগৃহে উৎসবের তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন পরিষদের ক্ষেত্র সামাজিক সমরসতা অভিযান প্রমুখ গৌতম সরকার। শেষে সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে গণ্যমান্য নাগরিকদের সঙ্গে সঙ্ঘের বিভাগ প্রচারক আশিস মণ্ডল, প্রবীণ প্রচারক বুদ্ধদেব মণ্ডল, পরিষদের জেলা সভাপতি কৃষ্ণেন্দু সরকার-সহ অনেক কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে সবাইকে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ২৭ তারিখ কান্দি প্রখণ্ডের গাঁতলা, ২৯, ৩০ রঘুনাথগঞ্জ জেলার ৪টি প্রখণ্ডে ক্ষেত্র সামাজিক সমরসতা প্রমুখ গৌতম সরকারের উপস্থিতিতে কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও এই দুই জেলার অনেক প্রখণ্ডে স্থাপনা দিবসের কার্যক্রম হয়।

With Best Compliments from -

A Well Wisher

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভক্তি প্রসারের পুরোধা শ্রীল প্রভুপাদ

পিন্টু সান্যাল

১৯৬৫ সালের আগস্ট মাস। একটি মালবাহী জাহাজের একটিমাত্র কেবিনে এক ৬৯ বছর বয়সের এক যুবক। হ্যাঁ যুবক। কারণ তিনি পরবর্তী ১২ বছরে যা করেছেন তা হাজার হাজার যুবক মিলেও করতে পারে না। জাহাজে সামুদ্রিক পীড়া, এমনকী দু'দুবার হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হলেও হার মানেননি। তাঁকে যে আমেরিকায় যেতেই হবে। প্রায় ৪৫০ বছর আগে এই বঙ্গের এক সন্ন্যাসীর ইচ্ছাপূরণ করতে— 'পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হইবে মোর হরি নাম।' শ্রীচৈতন্যদেবের এই বাণী আজ সত্য করে দেখিয়েছেন এই পশ্চিমবঙ্গের আর একজন সন্ন্যাসী।

'জলদূত' জাহাজে কৃষ্ণদূত হয়ে আমেরিকায় পা রেখেছিলেন শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। ৬৯ বছর বয়সে 'কৃষ্ণনাম' প্রচারের জন্য বিদেশযাত্রার আগের জীবন ছিল তাঁর মহাজীবনের প্রস্তুতিপূর্ব। সন্ন্যাস নেওয়ার আগে শ্রীল প্রভুপাদ ছিলেন এক ওষুধ ব্যবসায়ী অভয়চরণ দে। ১৮৯৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর উত্তর কলকাতার অধুনা এমজি রোডের ব্যবসায়ী গৌরমোহন দে-র ঘরে শ্রীল প্রভুপাদের জন্ম। গৌরমোহন দে ছিলেন শুদ্ধ বৈষ্ণব। তিনি তাঁর পুত্রকে কৃষ্ণভক্তরূপেই মানুষ করে তুলেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের মা রজনী দেবী গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিবারের কন্যা। ছোটো থেকেই পিতার উৎসাহে অভয়চরণ বন্ধুদের নিয়ে রথযাত্রার অনুষ্ঠান করতেন। কলেজে পড়ার সময় অভয়চরণের বিয়ে হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে বিদেশি পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কটের ডাকে সাড়া দিয়ে অভয়চরণ স্কটিশ চার্চ কলেজে চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষায় সফল হয়েও প্রাপ্য ডিপ্লোমা প্রত্যাখ্যান করেন।

অভয়চরণ দে কলকাতার 'বসু গবেষণাগার'-এ বিভাগীয় ম্যানেজার হিসেবে চাকরি করতে শুরু করেন। এইসময় ১৯২২ সালে শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে তাঁর গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি অভয়চরণকে বিশ্ব জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করতে বলেন। অভয়চরণ প্রথমে পরাধীন দেশে শ্রীচৈতন্যের বাণী তথা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারের ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। গুরুদেব বলেছিলেন, কৃষ্ণভাবনামৃত ভারতীয় রাজনীতির পরিবর্তনের জন্য

অপেক্ষা করতে পারে না। ১৯৩২ সালে অভয়চরণকে সপরিবারে ওষুধ ব্যবসার কাজে প্রয়াগরাজে যেতে হয় এবং সেখানে তিনি ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এরপরের ৩৩ বছর তিনি স্বদেশে থেকেই কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের কাজ করেন। ১৯৩৫ সালে গৌড়ীয় মঠের অন্তর্কলহে উদ্বিগ্ন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর অবর্তমানে মঠের ভবিষ্যৎ নিয়ে অভয়চরণের কাছে চিন্তা ব্যক্ত করেন।

গুরুদেব অভয়চরণকে ইংরেজিতে লেখার মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তি প্রচারের পথ দেখালেন। অভয়চরণ গৌড়ীয় মঠের 'The Harmonist' পত্রিকা থেকে লেখা শুরু করার পর 'Back to Godhead' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করলেন। লেখার কাজে মনোসংযোগ এবং কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের কাজে তাঁর ব্যবসায়িক ও পারিবারিক ক্ষতি হচ্ছিল। এমন সময় তাঁর দোকানে চুরি হয়ে যায়। এই ঘটনাকে ঈশ্বরের নির্দেশ মনে করে কলকাতায় তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে চিরবিচ্ছেদ ঘটালেন। যিনি শৈশবে ভালো আহার ও পরিধেয় পেয়েছিলেন, ১৯৫০ সালে সেই অভয়চরণ দে দিল্লির প্রচণ্ড শীতে শীতবস্ত্র ছাড়াই বিভিন্ন মানুষের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েও 'ব্যাক টু গডহেড' পত্রিকা বিতরণ করেছেন। সেই সময় তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ 'সময় নেই, সাধারণ মানুষের একটি নিত্য ব্যাধি' থেকে তাঁর সংকল্প সম্পর্কে ধারণা করা যায়। গ্রীষ্মকালে কখনো প্রচণ্ড গরমে, কখনো ষাঁড়ের গুঁতো খেয়ে পথের ধারে পড়ে থেকেও কৃষ্ণনাম করেছেন। ১৯৫৯ সালে বৃন্দাবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর অভয়চরণ দে হলেন শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী। এই সময় থেকেই শ্রীল প্রভুপাদ বিদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য ইংরেজিতে শ্রীমদ্ভাগবতমের ভাষ্য রচনা শুরু করেন। শ্রীমদ্ভাগবতমের প্রথম খণ্ডটি তিনি প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

মথুরার ব্যবসায়ী মি. আগরওয়ালের ছেলে পেনসিলভেনিয়ায় গোপাল আগরওয়ালের বাড়ি আমেরিকাতে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বাসস্থান। কেবলমাত্র একটি সুটকেস, একটি ছাতা এবং কিছু শুকনো খাদ্যশস্য সম্বল করে শ্রীল প্রভুপাদ পাড়ি দিলেন আমেরিকায়। আমেরিকায় বসে কবিতা লিখলেন :

'বড় কৃপা কৈলে কৃষ্ণ অধমের প্রতি।
কি লাগি আনিলে হেথা কর এবে গতি।।
আছে কিছু কার্য তব এই অনুমানে।
নহে কেন আনিবেন এই উগ্রস্থানে।।
রজস্তমো গুণে এরা সবাই আচ্ছন্ন।
বাসুদেব-কথা রুচি নহে সে প্রসন্ন।।
তবে যদি তব কৃপা হয় অহৈতুকী।
সকলই সম্ভব হয় তুমি সে কৌতুকী।।'

শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পেতে আরও পরীক্ষা বাকি ছিল প্রভুপাদের। বাটলার থেকে প্রভুপাদ নিউইয়র্কে পৌঁছালেন কৃষ্ণনাম প্রচার করতে। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী নিখিলানন্দের কাছে আশ্বাস পেলেন যে আমেরিকানদের মনোভাব ভক্তিযোগ অনুশীলনের পক্ষে অনুকূল। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ ভারতে চিঠি পাঠিয়ে গৌড়ীয় মঠ থেকে কোনো আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি পেলেন না। প্রথমে ড. রামমূর্তি মিশ্রের যোগ স্টুডিয়ো, তারপর প্যারাডক্স রেস্টোরেন্ট হলো প্রভুপাদের শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রচারের জায়গা। তাঁর ফ্ল্যাট থেকে টাইপরাইটার আর টেপরেকর্ডার চুরি হয়ে গেলে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন শহরের বস্তি 'দ্য বাওয়ারি'তে থাকার যাকে পৃথিবীর জঘন্যতম জায়গা বলা যেত।

একদল ভবঘুরে, নেশাচ্ছন্ন, আশ্রয়হীন মানুষের বাস ছিল বাওয়ারিতে। সেই সময় ভিয়েতনাম আক্রমণের প্রতিবাদে আমেরিকার যুবক সম্প্রদায় নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় সামাজিক বিধি নিষেধের তোয়াক্কা না করে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন শুরু করেছিলেন— এদের হিপি বলা হতো। কিন্তু প্রভুপাদের মধুর সুরে কীর্তন তাদের আকৃষ্ট করতো, প্রভুপাদ নিজের হাতে রান্না করে তাদের খাওয়াতেন। জাগতিক নেশার মোহে আচ্ছন্ন হিপিরা 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্রের মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান পেলেন। চিত্রকর, সংগীতশিল্পী, কবি, সাহিত্যিক যারা আমেরিকার ভোগ ঐশ্বর্যময় জড়বাদী জীবনধারার প্রতিবাদে 'হিপি' হয়েছিলেন, কৃষ্ণভক্তির মাধ্যমে তারা জীবনের পরম লক্ষ্যের সন্ধান পেলেন। প্রভুপাদ একটি 'কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করলেন 'Matchless gifts' নামে এক দোকানঘরে আর তার এজেন্ট মি. গার্ডিনার হলেন সঙ্ঘের প্রথম ট্রাস্টি যিনি প্রতিমাসে কুড়ি ডলার চাঁদা দিতে সম্মত হন। সত্যিই আজ 'International Society for Krishna Consciousness' বা ISKCON সমগ্র বিশ্বের প্রতি একটি অনবদ্য উপহার, ভোগবাদী সমাজকে কৃষ্ণভক্তির মাধ্যমে সঠিক দিশা দেখানোর জন্য। প্রভুপাদ হিপিদের প্রধান কেন্দ্র সানফ্রান্সিসকোতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

প্রশাসন বিশাল সংখ্যক উদ্ভ্রান্ত যুবকের উপস্থিতিতে উদ্বিগ্ন ছিল, ভয় পাচ্ছিল এই সামাজিক সমস্যার সমাধান না হলে নেশাগ্রস্ত হিপিদের দখলে চলে যাবে পুরো শহরটাই। নেশা ছাড়িয়ে হিপিদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রভুপাদকে অনুরোধ করেন। প্রভুপাদ পেরেছিলেন সেই সমস্ত যুবকদের নিয়ে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে কীর্তন করতে। ষাটের দশকে আমরিকার সংগীত জগতে পপ গায়কদের দল 'বিটলস্' যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। বিটলসের জর্জ হ্যারিসন শ্রীল প্রভুপাদের 'হরে কৃষ্ণ' আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়ে ভক্তিমূলক গান রেকর্ড করতে থাকেন। 'Lord whom we so long ignored', 'My Sweet Lord', 'Living in the material world'ইত্যাদি রেকর্ডের কোটি কোটি কপি বিক্রি হয়। 'হরেকৃষ্ণ মন্ত্র' রেকর্ড, আমেরিকার টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে কীর্তন প্রচার হতে লাগলো। এরপর একে একে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে কৃষ্ণ ভক্তদের দ্বারা ইসকনের কাজে গতি আনলেন।

ইসকন আজ সত্যিই 'আন্তর্জাতিক' সংস্থারূপে স্বীকৃত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আটশোর বেশি মন্দির আছে, ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। ভারতে করোনার সময় ইসকন বিনামূল্যে কয়েক লক্ষ মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করেছে। স্টিভ জোবস একটি বক্তব্যে তার বেকারত্বের দিনে ইসকনের রেস্টুরেন্টের বিনামূল্যে সুস্বাদু

খাবার গ্রহণের কথা বলেছেন। প্রভুপাদ Governing Body Commission তৈরি করে ইসকনের সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু চেয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মায়াপুর হবে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের প্রধান কেন্দ্র। আজ মায়াপুরে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে গীতাউপদেশ দিয়েছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদ পুঁজিবাদ ও কমিউনিজমের ঠান্ডা লড়াইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ধর্মের বাণী ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। আমেরিকায় সাফল্য পাওয়ার পর প্রভুপাদ তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া যাওয়া মনস্থ করলেন। ১৯৭১ সালে সোভিয়েত রাশিয়াতে ঢোকার অনুমতি পেলেও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি পাননি, এমনকী শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা সঙ্গে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি। প্রভুপাদ মস্কোর USSR Academy of Sciences-এর South Asian Studies বিভাগের অধ্যক্ষ প্রফেসর কটভস্কির সঙ্গে কথা বলে বুঝলেন কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশ্যে বৈদিক দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই সময়ের রাশিয়াকে তিনি 'আসুরিক সভ্যতা' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। ঘটনাচক্রে সেই সময় ভারতীয় দূতাবাসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার ছেলের রাশিয়ান বন্ধু ইভান প্রভুপাদের কথায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর ভক্ত হয়ে যান। শুরু হয় সোভিয়েত রাশিয়ায় 'হরে কৃষ্ণ' আন্দোলন।

কৃষ্ণভক্তদের সোভিয়েত রাশিয়ায় মানসিক হাসপাতাল ও জেলে রেখে দেওয়া হতো কিন্তু আজ মায়াপুরে গেলে দেখা যাবে রাশিয়ান কৃষ্ণ ভক্তের দল মৃদঙ্গ বাজিয়ে হরিনাম সংকীর্তন করছেন। মার্কসবাদ যে দেশে ধর্মকে আফিম বলে প্রচার করেছে সে দেশে রুশ ভাষায় অনূদিত গীতা ও ভক্তিবেদান্তের বই বিক্রি হয়েছে। মার্কসবাদ নিজেকে 'আন্তর্জাতিক' বললেও বিশ্বের হাতে গোনা কয়েকটি দেশে কমিউনিজমের অস্তিত্ব আছে আর কমিউনিজমের সম্পূর্ণ বিপরীত 'কৃষ্ণভাবনামৃত' বিশ্বের প্রায় সব দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে— এ থেকেই বোঝা যায় বস্তুবাদী চিন্তাধারা আধ্যাত্মিক ভাবধারার তুলনায় কত দুর্বল আর মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। বিশ্বের ঊনষাটটি ভাষায় প্রভুপাদের 'Bhagvad Gita As it is' প্রকাশিত হয়েছে। যে বয়সে মানুষ অবসর গ্রহণ করে সেই বয়স থেকে শুরু করে শ্রীল প্রভুপাদ মাত্র ১২ বছরের মধ্যে ১৪ বার পৃথিবী ভ্রমণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ১৭০টি প্রধান শহরে প্রতি বছর রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭৭ সালের ১৪ নভেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনে তাঁর ইহলীলা সাঙ্গ করেন। তিনি 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা যথাযথ'-এর মুখবন্ধে সনাতন ধর্মের অর্থ সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলেছেন, 'বর্তমান জগতে ধর্ম বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি, সনাতন ধর্ম ঠিক তা নয়। সনাতন ধর্ম বলতে যে ধর্ম বোঝায়, তা আমাদের বুঝতে হবে ধর্ম কথাটির সংস্কৃত অর্থের মাধ্যমে। ধর্ম বলতে বোঝায় যা অপরিহার্য অঙ্গরূপে কোনো কিছুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।' অর্থাৎ প্রভুপাদ বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি আর 'ধর্ম'-এর পার্থক্য সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূর করতে চেয়েছেন। ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক বলে, অষ্টম শতকে ভারতে যে ভক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা ভারতের স্বাধীনতার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ প্রমাণ করেছেন ভক্তি আন্দোলনের সুবর্ণযুগ বিশ্ব এখনো প্রত্যক্ষ করেনি। আর এই আন্দোলন শীতকালীন শিশিরপাতের মতো নিঃশব্দে সমগ্র বিশ্বে গীতার বাণী প্রচার করে চলেছে মানবজাতিকে উত্তরণের পথে নিয়ে যেতে।

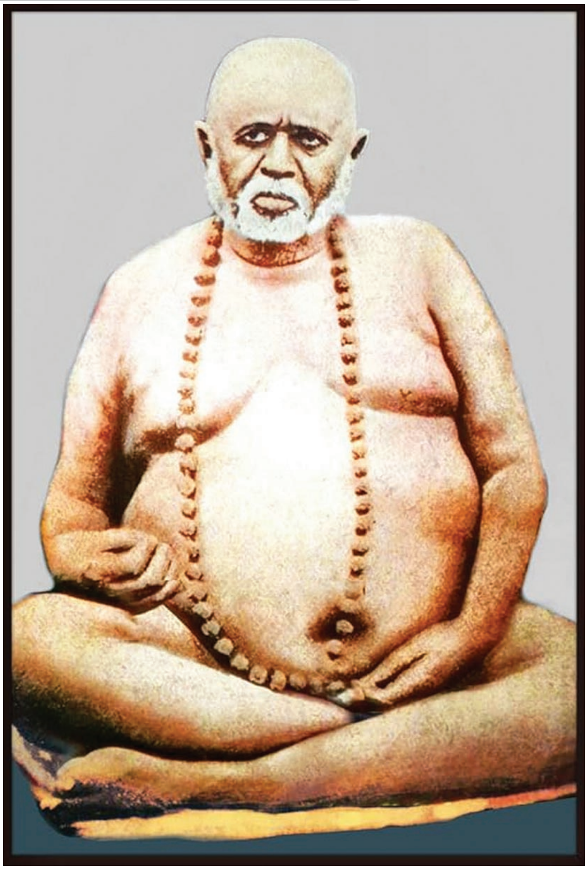

দীর্ঘজীবী সাধক

শ্রীশ্রী ত্রৈলঙ্গস্বামী

দীপক খাঁ

শ্রীশ্রী ত্রৈলঙ্গস্বামীর পূর্বনাম শিবরামা (শিবের বরপুত্র)। অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের বিজয়নগরের কুম্বলিপুরম গ্রামের এক সুখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন ইংরেজি ১৬০৭ সালে। বাবার নাম নরসিংহরাও। মাতার নাম বিদ্যাবতী দেবী। অনেক দিন তাঁদের পুত্র সন্তান না হওয়ায় শিবের আরাধনা করে এই পুত্র লাভ করেন। মায়ের কাছে কালীমন্ত্র পেয়ে শিবরামা স্থানীয় কালীমন্দিরে মা কালীর তপস্যায় মগ্ন হন। তিনি মায়ের অগ্নিদাহ করার পর তাঁর চিতাভস্ম মেখে কালীমাতার সাধনায় ব্রতী হন। ২০ বছর সাধনার পর গুরু ভগীরথানন্দের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। হিমালয়ে কিছুদিন সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় সাধনা করেন। প্রচণ্ড শীতে বরফসঙ্কুল পর্বতের গুহায় নির্বস্ত্র শিবরামা তপস্যায় ব্রতী হয়ে সিদ্ধিলাভ করেন।

তাঁর মা ছোটোবেলা থেকেই শিবরামাকে নানা ধর্মপুস্তক পড়াতেন ও ধর্ম উপদেশ দিতেন। শিবরামা বিয়ে করেননি। দীক্ষা নিয়ে কয়েক বছর সাধনার পর গুরুর সঙ্গে পুষ্কর তীর্থে স্নান করেন। তখন তাঁর নাম হয় (গুরু রত্নানন্দের কথায়) গণপতি সরস্বতী। পুষ্করে অবস্থানকালে তাঁর গুরুদেব পরলোক প্রাপ্ত হন। পুষ্কর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি রামেশ্বরম আসেন। রামেশ্বরমে তিনি একটি মৃত বালকের প্রাণ ফিরিয়ে দেন এবং তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যান। কিছুদিন পরে নেপালের একটি জঙ্গলে পুনরায় সাধনায় ব্রতী হন। সেখানকার রাজা বনে শিকারে আসেন, বাঘটি শিকার হবার ভয়ে তাঁর গণপতি সরস্বতীর সাধন স্থলে এসে ওনার আশ্রয় নেয়। তাঁর উপদেশে রাজা বাঘ শিকার থেকে বিরত হন।

গণপতিজী আদি শঙ্করাচার্যের দশনামি সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী হয়েছিলেন বলে তাঁর পূর্ববর্তী গুরু ওনার নাম ত্রৈলঙ্গস্বামী রাখেন। ত্রৈলঙ্গস্বামী একটি বিধবার একমাত্র সদ্যোমৃত সন্তানকে যোগবলে পুনর্জীবিত করেন এবং তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হন। একদিন তিনি কাশীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কয়েকদিন তাঁর ওখানে ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নাম দেন 'চলমান শিব'। একবার রামকৃষ্ণদেব বারো কিলো চালের ভাত তাঁকে খেতে দেন। তিনি ওই ভাত পুরোটাই খেয়ে ফেলেন। এরপর গঙ্গাতীরে তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কাশীতে অবস্থানকালেই লোকনাথ ব্রহ্মচারী ও মাধবানন্দ স্বামীর পরিব্রাজন অভিভাবক হয়ে সুমেরু অভিযানে যাত্রা করেন পদব্রজে নির্বস্ত্র হয়ে সকলে হিমালয়, মানস সরোবর কৈলাশ পার হয়ে আরব পার হয়ে ইউরোপে ভ্রমণ করে। রাশিয়ার সাইবেরিয়া পার হয়ে বহু নদী, জলাশয় পার হয়ে শীতকালে মেরুপ্রদেশের বরফ ডিঙিয়ে পৌঁছেছিলেন। সেখানে ছ'মাস চব্বিশ ঘণ্টা অন্ধকার হয়ে থাকত। এই জনমানবহীন বরফের দেশে কয়েকমাস থেকে দীর্ঘ পঁচিশ বছরের পদযাত্রা শেষ করে কাশীতে ফিরে আসেন। কাশীতে এসে গঙ্গার অসিঘাট, বেদব্যাস আশ্রম, হনুমানঘাট এবং পবিত্র দশাশ্বমেধ ঘাটে থাকতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গঙ্গাস্নান করতেন এবং গঙ্গায় ভেসে থাকতেন। প্রায় দুশো আশি বছর পৃথিবীতে থেকে, অধিকাংশ সময় তপস্যা ও ঈশ্বরের খোঁজে সময় অতিবাহিত করে ইংরেজি ১৮৮৭ সালে অমৃতধাম যাত্রা করেন। তাঁর ভক্ত শিষ্য সকলে তাঁর দেহ কাঠের ভেলায় গঙ্গাবক্ষে ভাসিয়ে দেন তাঁর পূর্ব ইচ্ছা অনুযায়ী। কয়েকদিন পর ভেলাটি ফিরে আসে এবং দেখা যায় ভেলার উপর অসংখ্য পদ্ম, গোলাপ ও সুগন্ধি তাজা ফুল। দেহ রাখার আগে কাশীতে মানব হিতে অসংখ্য অলৌকিক ক্রিয়া করেন বলে কাশীর ভক্তমণ্ডলী তাঁকে 'হিতলাল মিশ্র' বলে সম্বোধন করেন। □

দুর্নীতি চাপা দিতেই কি অভয়াকে প্রাণ দিতে হলো ?

দেবজিৎ সরকার

১ নং ক্ষুদিরাম বোস সরণী, থানা টালা, কলকাতা ৭০০০০৪। এই ঠিকানাটি সারা পৃথিবীর প্রায় সবাই এখন চেনে, কারণ এটাই আরজি কর হাসপাতাল। এই হাসপাতালের মাথায় বসেছিলেন ড. সন্দীপ ঘোষ, যিনি আরজি কর হাসপাতালের প্রিন্সিপালের চেয়ার আলো করে বসেছিলেন। গত বেশ কয়েক বছর ধরে একের পর এক দুর্নীতির পাহাড় তৈরি করে যাচ্ছিলেন। বলাবাহুল্য, রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের শেষ কথা এবং রাজ্য মন্ত্রীসভার প্রথম জন উৎকোচ ও উপঢৌকনের বিনিময়ে সব জেনেও চুপ করেছিলেন। ঠিক কী কী করতেন সন্দীপবাবু? কোন কোন দুর্নীতির ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে তাঁর উজ্জ্বল স্বাক্ষর? আসুন, একটু খতিয়ে দেখা যাক।

মৃতদেহ সমূহের বেআইনি ব্যবহার ও চূড়ান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘন :

(১) ৩০.১২.২০২২, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, ENT আরজি কর হাসপাতালের প্রিন্সিপাল সন্দীপবাবুর কাছে ৬টি মৃতদেহ চেয়ে পাঠালেন, যেগুলো কিনা 'ফ্রেশ' হতে হবে ওয়ার্কশপের জন্য। সন্দীপবাবু দেখলেন এবং ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টকে আবেদনপত্রটি ফরোয়ার্ড করেলেন। ০৫. ০১.২০২৩ তারিখে ৫টি 'ফ্রেশ' মরদেহ ENT ডিপার্টমেন্টের সেমিনারের কাছে পৌঁছে গেল। মরদেহগুলির বাড়ির লোকেরা জানতে পারলে আঁতকে উঠবেন যে সেই ওয়ার্কশপ হয়ে যাওয়ার পরে দেহগুলিকে পোস্টমর্টমের জন্য আরজি কর মর্গে পাঠানো হলো এবং আরজি করের মর্গ কলকাতা পুলিশকে ১০ জানুয়ারি ২০২৩, বেলা ৩টা ২১মিনিটে ওই মরদেহগুলির পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাঠায়। যেখানে প্রতিটি পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে লেখা রইলো— 'abrasion 0.1" each nasal mucosa just above the both nostrils. Both the abrasions are yellowish in colour and post-mortem in nature.' রোগীর আত্মীয় বা কোনো ব্যক্তির নিজস্ব লিখিত অনুমোদন ছাড়াই মৃতদেহের উপর এইরকম কাটাছেঁড়া বা পরীক্ষানিরীক্ষা করার অধিকার ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস

কমিশনের গাইড লাইনের তীব্র বিরোধী। দ্বিতীয়ত, মৃতদেহের পোস্টমর্টেমের পরে মিথ্যা পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট দাখিল করার মতো জঘন্য অপরাধের মাথায় বসেছিলেন এই সন্দীপ ঘোষ। এই প্রতিবেদনে একটি এইরকম ঘটনার উল্লেখ করা হলো। এরকম বহু ঘটনা তদন্তের পরে উন্মোচিত হবে।

(২) জৈববর্জ্য বিক্রির সিন্ডিকেটের মাথার উপর বসে থাকা সন্দীপ ঘোষ ঃ-

সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৩— কলকাতা শহরের দু'টি ব্যস্ততম হাসপাতাল। নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল এবং আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল কলকাতা শহরের ব্যস্ততম দু'টি হাসপাতালে ৬ মাসের জৈববর্জ্যের পরিমাণ দাঁড়ালো যথাক্রমে ১, ৩৩,৬৫০ কেজি এবং ৪৯,৬০২.৪৪ কেজি। ভাবতে পারেন, শহর কলকাতার মাঝখানে নীলরতন সরকার হাসপাতালের তুলনায় আরজি করের জৈববর্জ্যের পরিমাণ দাঁড়ালো মোটামুটি তিন ভাগের এক ভাগ।

পাঠকের সুবিধার্থে জৈববর্জ্য সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক। রোগীর শরীরের বর্জ্য পদার্থ ছাড়াও সিরিঞ্জ অ্যান্ড গ্লাভস, ব্যবহৃত স্যালাইন বোতল ইত্যাদিকে জৈববর্জ্য বলা হয়।

০২.৩.২০২৩, মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও ভাইস প্রিন্সিপাল আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল RGKH/BMW/918 নং মেমোতে একটি আদেশের মাধ্যমে জানালেন, জৈববর্জ্যগুলি সঠিক মান অনুযায়ী ব্যবস্থিত হচ্ছে না। এই মেমোর কপি স্বাস্থ্য দপ্তরেও গেল। পাশাপাশি একই ক্ষেত্রে বিভিন্ন নালিশ এসে জমা পড়তে থাকলো। আরও মজার কথা, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও টিভি চ্যানেলে এই বিষয়ে আলোচনা চলতেই থাকলো।

যথারীতি চাপে পড়ে একটা ইনকোয়ারি কমিটি গঠিত হলো এবং চাপে পড়ে সেই কমিটি তাদের রিপোর্ট ১৭. ০৩.২০২৩-এ MSVP আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে জমা দিলেন।ওই রিপোর্টে পরিষ্কার বলা হলো যে জনৈক শঙ্কর রাউত এবং তার দলবল মিলে এইসব জৈববর্জ্য বা বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে বিক্রি করছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে জৈববর্জ্য ব্যবস্থার কোনো প্রোটোকলই মানছে না। কমিটির রিপোর্টে আরও পরিষ্কার, জনৈক শঙ্কর রাউত ও তার দলবল জনৈক আফজল ও জনৈক আফসার খান যারা কিনা ডাঃ সন্দীপ ঘোষের খুব কাছের লোক। তাদের নির্দেশে এই কাজ চলে।

এই রিপোর্ট আসার পরে আখতার আলি, ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট (NM) আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল এই ইনকোয়ারি অফিসের চেয়ারম্যানকে একটি চিঠি দিয়ে জানান যে জনৈক শঙ্কর রাউত জৈববর্জ্য রবি, পাঁচু প্রভৃতি কিছু বহিরাগতকে বিক্রি করতেন জনৈক আফসার খানের নির্দেশে, যে কিনা ডাঃ সন্দীপ ঘোষের অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করতো। এদের মধ্যে রবি নাকি বাংলাদেশের নাগরিক!

ভাবা যায়, একটা সরকারি হাসপাতালের ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, গ্লাভস, স্যালাইনের বোতল বারবার ব্যবহৃত হচ্ছে, যা থেকে এইডস সহ অন্যান্য যৌনরোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে!

(৩) স্কিল ল্যাব তৈরির নামে চড়া দামে যন্ত্রপাতি কিনে জনগণের টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ ঃ

ডিরেক্টর অফ মেডিক্যাল অফিসার পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত নেন UG/PG এবং পোস্ট ডক্টরেট ছাত্রদের জন্য স্কিল ল্যাব তৈরি করার এবং সেই মতো আরজি কর কলেজ ও হাসপাতালে কাজ করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়। ব্যাস, টাকা আসছে, আর কে পায়! সঙ্গে সঙ্গে একটা মেমো ইস্যু হলো। মেমো নং- RKC/ MC/PRIN/eNIT-022/(21, 22 dt.12.2020)। টেন্ডার করা হলো যন্ত্রপাতি কেনার জন্য।

M/S. VISCA Solutions বলে একটা কোম্পানি, যারা এই টেন্ডারে অংশ নেয়, তারা ২২. ০৯.২০২৩ তারিখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে একটি অভিযোগপত্র জমা দেয়। এই ক্ষেত্রে নিয়ম হলো প্রথমে টেন্ডারে অংশগ্রহণকারীদের কারিগরি সক্ষমতা দেখা হবে, তারপর তাদের অর্থকরী দিকটি দেখা হবে অর্থাৎ প্রথমে টেকনিক্যাল দিক দেখার পরে সন্তুষ্ট হলে তবেই তাদের ফাইন্যানসিয়াল বিড্‌টি খোলা হবে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মেমো থেকে স্পষ্ট যে এই ক্ষেত্রে পুরো উলটোটাই করা হয়। জনৈক মেসার্স মা তারা টেডার্স যাকে কিনা আরজি কর কলেজ ও হাসপাতালে সর্বত্র কিছু না কিছুর সাপ্লায়ার হিসেবে দেখা যায়, তারা এই স্কিল ল্যাবে সর্বনিম্ন কোট করেন ২ কোটি ৯৭ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা।

মজার কথা হলো, রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের একই অর্ডারের ভিত্তিতে সমমান কিংবা এর চেয়ে ভালো মানের স্কিল ল্যাব তৈরি হচ্ছে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে। সেক্ষেত্রে টেন্ডারটি পেয়েছে জনৈক মেডিল্যাব অ্যান্ড কোম্পানি এবং সেক্ষেত্রে খরচের পরিমাণ মাত্র ৬১ লক্ষ ৪৭ হাজার ২৯৪ টাকা যা আরজি করের তুলনায় ২০ শতাংশের কাছাকাছি মাত্র। তাহলে এত বেশি টাকা লাগলো কেন? তার উত্তর জানেন স্বনামধন্য প্রফেসর ডাঃ সন্দীপ ঘোষ এবং স্বয়ং মা তারা।

(৫) আরজি কর হাসপাতালে বিভিন্ন

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

যন্ত্রপাতি কেনা ঠিক কীভাবে হতো?

এই বিষয়টা খতিয়ে দেখে বলতে গেলে এবং সব নথিপত্র এক জায়গায় জড়ো করলে এই পত্রিকার ৪টি সংখ্যার সমান নিউজপ্রিন্ট খরচ হয়ে যাবে। ছোট্ট দু'টি উদাহরণ, কোভিড প্যানডেমিকের সময় সন্দীপবাবু হাসপাতালের তরফ থেকে কয়েকটি High Flow Nasal Oxygenation Machine with Pediatric and Adult Circuit -এর অর্ডার দেন। অর্ডার অনুযায়ী প্রতিটি মেশিন হাসপাতালে আসে ৪,৩০,০০০ টাকা এবং অতিরিক্ত GST সহ (মেমো নং- RKC 3413 dated 17.08.2021), যেখানে একই যন্ত্রপাতি অরবিন্দ সেবাকেন্দ্র ১,৮০,০০০ টাকায় কিনেছে এবং স্যাম স্টিল একই সময় একই যন্ত্র ১,৭৫,০০০ টাকায় কিনেছে। সুতরাং সর্বাধিক ১,৮০,০০০ টাকার যন্ত্র ৪,৩০,০০০ টাকা বেশি সরকারি অর্থ দিয়ে কেনার লোকটি ছিলেন এই ডাঃ সন্দীপ ঘোষ। এই সব ঘটনা স্বাস্থ্য দপ্তর জানতো না? স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী জানতেন না? নাকি প্রণামির জোরে চোখ বন্ধ করেছিলেন?

উদাহরণ : রাজ্যের প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে ব্যবহৃত যন্ত্রগুলির মধ্যে কিছু যন্ত্রকে ক্যাটাগরি আইটেমের মধ্যে ফেলা হয়। এই যন্ত্র বা অংশগুলি কোনো হাসপাতাল সরাসরি বাজার থেকে কিনতে পারে না। রাজ্যের অধীনস্থ সংস্থা West Bengal Medical Services Corporation Limited রাজ্যব্যাপী টেন্ডারের মাধ্যমে তা কিনে সরকারি হাসপাতালগুলিতে সরবরাহ করে থাকে। "Syringe Pumps" এমনই একটি ক্যাটাগরি আইটেমভুক্ত যন্ত্র। সন্দীপবাবু জনৈক মেসার্স হাজরা মেডিক্যাল থেকে ১,৮০,০০০ টাকা দরে সমস্ত আইন ভেঙে সরাসরি দু'টি যন্ত্র কিনে ফেললেন। কেউ কিছু বলতে পারবেন না, তার কারণ তার মাথার উপর স্বয়ং কালীঘাট আছে। সময়টাতো গড়িয়েছে।

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে আর্থিক কেলেঙ্কারি গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছে। ডাঃ সন্দীপ ঘোষ সবকিছুর উপরে সর্বেসর্বা হয়ে দুর্নীতির মাথা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ফুডস্টল থেকে কার পার্কিং,

ডা: সন্দীপ ঘোষ

ওয়াটার পিউরিফায়ার থেকে মাইকিং সিস্টেম, বিভিন্ন যন্ত্র থেকে যন্ত্রাংশ, সার্টিফিকেট থেকে উত্তরীয়, পর্দা থেকে মেডেল, ফুল থেকে স্কিল ল্যাব যত্রতত্র সর্বত্র শ্রীযুক্ত প্রফেসর ডাঃ সন্দীপ ঘোষ এবং তৎসহ মা তারা।

এরই মাঝে M.D Devices & Systems লিখিতভাবে অভিযোগ করেছিলেন (Ref. No. RGK/23. deted 27.02.2023) যে , প্রতি টেন্ডারে সমস্ত ভেন্ডারকে ২০ শতাংশ কাটমানি দিতে হবে, যার মধ্যে ১০ শতাংশ কাটমানি অর্ডার পাওয়ার আগে কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

সমস্ত দুর্নীতির কথা রাজ্য সরকারের অ্যান্টি-করাপশন ব্রাঞ্চ রাজ্য সরকারের Principal Secretary -কে একটি লিখিত পত্রে জানায় যার মেমো নং- 394/1(1) DIG/ACB(C)/262/2023. dated 20.7.23 যা স্বয়ং ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ নিজে ফরোয়ার্ড করেছিলেন।

অতঃপর? পুরো নাটক! ২১-৯-২০২৩ সালে সন্দীপবাবু মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে Professor of Orthopedic department-এ ট্রান্সফার হয়ে গেলেন। তারপর কালীঘাটের জাদুবিদ্যার জোরে কয়েকদিনের মধ্যে তিনি আবার আরজি করের প্রিন্সিপাল হিসেবে যোগ দিলেন।

এক্ষেত্রে টিএমসি, টিএমসিপি, রোগী কল্যাণ কেন্দ্র, ডাঃ সন্দীপ ঘোষ,নর্থ বেঙ্গল সিন্ডিকেট গ্যাং মোটা টাকা দিয়ে পাশ করতে বাধ্য হওয়া ছাত্র-ছাত্রীরা, মৃতদেহ কেনা-বেচা করানো লোকজন, ভরা মিটিঙে পদস্থ অফিসারদের মুখের উপরে নীল গেঞ্জি পরে 'আমি একটু জোরেই কথা বলি। আমি কে? সেটা সিএম দিদির কাছে ফোন করে জেনে নেবেন' বলা 'সিকিউরিটি গার্ড' সবাই আগাপাশতলা জড়িত। জানা ছিল জয় মা তারা আর কালীঘাটের তারাও। রাজ্যের সাংসদ, বিরোধী দলের সভাপতি ২০২৩ সালে নভেম্বর মাসে একটি চিঠি দেন Enforcement Department কে। সেই চিঠির বলে ২০২৪-এর মার্চ মাসের ৭ তারিখে মাননীয় A.C.J.M. শিয়ালদহ 156 (3) cr. p.c-তে একটি মামলা দায়ের করেন জনৈক তাপসচন্দ্র পাল, যেটি শিয়ালদহ A.C.J.M কোর্টে Misc.Gl. case 51/2024 হিসেবে নথিভুক্ত হয়, আর তাতে টালা থানাকে তদন্ত করতে নির্দেশ দেন কোর্ট কর্তৃপক্ষ। মামলাটি এখনও বিচারাধীন।

এইসব দুর্নীতি কিছুটা জেনে ফেলার জন্য কি যোগী পরিবারের মেয়েটিকে প্রাণ দিতে হলো? সময় এর উত্তর দেবে।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

পাত্রী চাই

কলকাতা মানিকতলা নিবাসী ডাক্তার পাত্রের জন্য কলকাতা অথবা পার্শ্ববর্তী জেলা নিবাসী, পশ্চিমবঙ্গীয় বনেদি পরিবারের ২৫ অনূর্ধ্বা, শিক্ষিতা, ৫'৫", সুশ্রী, সুপাত্রী চাই। ডাক্তার পাত্রী অগ্রগণ্যা। দেবারি কিংবা দেবগণ কাম্য। যোগাযোগ : ৮৭৭৭৮১৬৪০০

পশ্চিমবঙ্গে কি এবার রাষ্ট্রপতি শাসন?

কানু রঞ্জন দেবনাথ

কারও অধঃপতন হলে বলা হয় তার ষোলোকলা পূর্ণ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীরও নাকি ষোলোকলা গত ২৮ আগস্টে পূর্ণ হয়েছে। কারণ সেদিন তিনি তার দলের ছাত্র সংগঠনের ভাষণে যেসব কথা বলেছেন, সেসব কথা একজন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বা রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হয়ে কখনোই বলতে পারেন না। কী কথা বলেছেন সেদিন তা অবশ্যই সবাই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে জেনে গেছেন। আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এখন নাকি সময়ের অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির।

এখন বোধ হয় আলিমুদ্দিনের নেতা-নেত্রীরা আর বলতে পারবেন না যে 'মোদী-দিদি সেটিং' আছে, এখন উলটোভাবে সাধারণ মানুষ লক্ষ্য করছে যে এবার যদি সত্যি সত্যি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস ও বামেদের অবস্থান কী হবে? তারা কি এটাকে সমর্থন জানাবে নাকি আবার সেই ২৭ আগস্টের ছাত্রসমাজের নবান্ন অভিযানের মতোই বিরোধিতা করবে?

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হতে পারে কিনা তা জানতে হলে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে যে রাষ্ট্রপতি শাসন কী এবং কেন জারি করা হয়?

যদি কোনো রাজ্য সরকার তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন না করে, তবে রাজ্যপালের রিপোর্ট পাওয়ার পরে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার অনুমতি দেন। এর মাধ্যমে রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর বদলে সরাসরি রাষ্ট্রপতির হাতে আসে। কিন্তু প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের রাজ্যপালকে নির্বাহী ক্ষমতা প্রদান করে। রাষ্ট্রপতি শাসন সংক্রান্ত বিধান সংবিধানের ৩৫২, ৩৫৬ ও ৩৬৫ অনুচ্ছেদে দেওয়া আছে।

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির জন্য নীচের কারণগুলি কি যথেষ্ট নয়?

(১) প্রতিটি ভোটের সময় মাত্রাতিরিক্ত সন্ত্রাস, র‍্যাগিং, মারামারি, খুন যা কেন্দ্রীয় বাহিনী পর্যন্ত বন্ধ করতে ব্যর্থ।

(২) কোভিডের মতো মহামারির সময় কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু কিছু গাইড লাইন মানতে অস্বীকার।

(৩) নির্বাচনের সময় অন্যদলের নেতাদের প্রচারে বাধাদান, এমনকী প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টারকেও অনেক সময় নামতে বাধা দেওয়া।

(৪) কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প রাজ্য সরকার চালু না করা। যেমন আয়ুষ্মান কার্ড, পিএম আবাস ইত্যাদি।

(৫) একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে সংসদে পাশ হওয়া আইন নিয়ে ভুল বুঝিয়ে খেপিয়ে তোলা এবং তার ফলে জাতীয় সম্পত্তি নষ্ট করা।

(৬) সংসদে পাশ হওয়া আইনকে বা সাংবিধানিক আইনকে মানতে অস্বীকার করে কেন্দ্রকে হুমকি দেওয়া।

(৭) নারদা, সারদা, রোজভ্যালি ইত্যাদির দুর্নীতিকাণ্ডে রাজ্য সরকারের জরিয়ে পড়া।

(৮) রাজ্য মন্ত্রীসভার হেভিওয়েট কয়েকজন মন্ত্রীর দুর্নীতিতে জড়ানোর ফলে জেলযাপন।

(৯) দেশবিরোধী শক্তির ঘাঁটি হিসেবে রাজ্যকে ব্যবহার করা এবং রাজ্য সরকারের গোয়েন্দারা তা টের না পাওয়া।

(১০) বিভিন্ন সরকারি চাকরি নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে রাজ্যের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া।

(১১) কেন্দ্রীয় বাহিনী যেমন বিএসএফের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষকে খেপিয়ে তোলা এবং বিএসএফের নির্দেশ অমান্য ইত্যাদি।

(১২) সন্দেশখালির নারী নিগ্রহের ঘটনাতে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় তফশিলি জাতি কমিশনের চেয়ারপার্সন কর্তৃক রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে আর্জি জানানো।

(১৩) সম্প্রতি আরজি কর হাসপাতালের বীভৎস ঘটনাবলী এবং এই গত ২৮ তারিখে তার দলের একটি কর্মসূচিতে দেওয়া মমতা ব্যানার্জির ভাষণ।

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির পক্ষে সর্বশেষ কথা বলার অধিকারী ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। এখন দেখা যাক, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ভারত সরকার তথা ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে কী রিপোর্ট পাঠান এবং ভারতের রাষ্ট্রপতিই বা পরবর্তী কী সিদ্ধান্ত নেয়, তা দেখা। □

ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডসে স্থান পাওয়ার মাধ্যমে সায়নের প্রতিভার স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ বিধানসভার নামখানা ব্লকের নারায়ণপুরের ছেলে সায়ন মিদ্দা। তাঁর বাবা একজন কৃষক। পরিবারটি অত্যন্ত দরিদ্র। অভাব-অনটনের মধ্য দিয়েই দিন অতিবাহিত হয় তাদের। ছোটোবেলায় সায়নের স্বপ্ন ছিল রং-তুলির ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলবে অভিনব কোনো কিছু। ছোটো থেকেই সায়ন যা দেখত, সবই রং-তুলির মাধ্যমে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলত। তাঁর ইচ্ছে ছিল এমন কিছু তাঁকে করে দেখাতে হবে যাতে বাবা মায়ের মুখ উজ্জ্বল হয়। কম বয়সেই রং-তুলির ক্যানভাসে ধরে রাখত সে বিশ্বজগৎকে। ক্যানভাসেই রেখে যেত তাঁর প্রতিভার সাক্ষর। গণেশ নগর বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করে সায়ন। তারপর নামখানা নারায়ণ বিদ্যামন্দির থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল করে সে। উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্য লাভের পর তাঁর স্বপ্নকে সার্থক করার উপায় খুঁজতে থাকে সায়ন। ইন্টারনেটে নানা ভাবে সার্চ করে সে পায় একটি অজানা তথ্য। সায়ন জানতে পারে যে রং-তুলির ক্যানভাসে অনেক শিল্পী সাফল্য পেলেও একটি ক্যানভাসে ব্লেড দিয়ে কোনো নারীর প্রতিকৃতি আগে কেউ কখনও তৈরি করেনি। এই তথ্যের সন্ধান পেয়ে করে ফেলে এক অভিনব পরিকল্পনা। সম্প্রতি ৭০টি ব্লেডের টুকরো ব্যবহার করে প্রায় এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ক্যানভাসের মধ্যেই সে ফুটিয়ে তোলে এক নারীমূর্তির প্রতিকৃতি। ব্লেড ব্যবহার করে ক্যানভাসে এক নারীর ছবি ফুটিয়ে তুলে ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডসে স্থান পায় সুন্দরবনের সায়ন।

এলাকার শিশুদের আঁকা শেখায় সায়ন। দুঃস্থ শিশুদের কথা চিন্তা করে তাদের বিনামূল্যেও প্রশিক্ষণ দেয় সে। তাঁর আঁকা ছবি দেশ-বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় চিত্রকলা প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। নিজের সৃষ্টির বিষয়ে সায়ন বলে— 'নারীকে নিয়ে বিভিন্ন শিল্পীর সৃষ্টি থাকলেও, ব্লেড দিয়ে কোনো নারীমূর্তি ফুটিয়ে তোলা হয়নি। তাই ৭০টি ব্লেডের টুকরো দিয়ে এই নারীমূর্তির অবয়বকে ফুটিয়ে তুলেছি'। ইতিমধ্যেই সায়নের এই সৃষ্টি জায়গা করে নিয়েছে ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডসে।

সায়নের এই সাফল্যে খুশি তাঁর পরিবার-পরিজন থেকে শুরু করে প্রত্যেকে। তাঁকে সাফল্যের শীর্ষে দেখতে চান মা বাসন্তী মিদ্দা ও পিসিমা লক্ষ্মী পাল। তাঁরা চান আগামীদিনে দেশ-বিদেশে স্থান করে নিক সায়ন। সায়নের ইচ্ছা আগামীদিনে ফ্যাশন ডিজাইনার হওয়া। দেশ-বিদেশে তাঁর আঁকা ছড়িয়ে পড়বে একদিন, সেই স্বপ্নকে সামনে রেখেই এগিয়ে যেতে চান সায়ন।

সমাজের প্রান্তিক স্তর থেকে উঠে আসা সায়নের এই অদম্য লড়াই, তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার এই সাম্প্রতিক স্বীকৃতি আগামী দিনে সব শিল্পীদের কাছে হয়ে উঠবে প্রেরণার উজ্জ্বল উৎস। □

ইচ্ছা

রিনু, একটি ছোট্ট মেয়ে। আট বছর বয়স। মা-বাবার সঙ্গে দুর্গাপুরে থাকে সে। সেখানে তাদের দোতলা দালানবাড়ি। রিনু খুব ভালো মেয়ে। মা-বাবা যা দেয় তাই-ই খায়, যে পোশাক দেয় তাই পরে। তবে, ছোটোবেলা থেকেই সে খুব কুকুর পছন্দ করে। কুকুরের জাত নিয়ে তার কোনো খুঁতখুঁতে নেই, সবরকম কুকরই তার প্রিয়।

রিনুর খুব ইচ্ছা কুকুর পুষবে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এটাই যে, বাবা-মা কোনদিনই এতে রাজি হয়নি। রিনু বাড়ির বাগানে নিজের হাতে কাঠ দিয়ে কুকুরের জন্য ঘর বানিয়েছিল। কুকুরের সঙ্গে খেলবে বলে বাবাকে বলে বলে একটা ফুটবল আনিয়েছিল, আর একটা বাটি, কুকুরকে খেতে দেবে বলে। কিন্তু শুধু আসেনি কোনো কুকুর। মাঝেমাঝে তার জন্য রিনু মন খারাপ করে বাগানের সেই কুকুরের ঘরটার সামনে বসে থাকে ।

একদিন সন্ধ্যেবেলা রিনুর বাবা টিভিতে খবর দেখছিলেন। পাশের ঘরে রিনু পড়ছিল। রিনুর হঠাৎ জলতেষ্টা পায়। কাছে জলের বোতলটা ধারে কাছে না দেখতে পেয়ে পাশে বাবার ঘরে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে টিভিতে খবরে দেখাচ্ছে, দুর্গাপূজার বাজার করতে গিয়ে একটা শিশু হারিয়ে গেছে। তার মা হাউমাউ করে কাঁদছে। তা দেখে রিনু খুব দুঃখ পেল আর মনে মনে কী যেন একটা ভাবতে লাগলো। রিনু ফিরে এলো নিজের ঘরে।

রিনু বেমালুম ভুলে গেছে কী করতে গিয়েছিল পাশের ঘরে। সেই রাতে পড়াশোনা শেষ করে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যেও রিনু ওই মহিলার আর্তনাদ শুনতে পায়। তার ঘুম ভেঙে যায়। হঠাৎ কী খেয়াল হলো কী জানি, রিনুর মনে হলো, আমরা যে কত পশুপাখি পুষি তারাও তো ছোট্টো বয়সে মাকে ছেড়ে চলে যায়। পশুপাখিরা মানুষ নয় বলে কি তাদের হৃদয় নেই ? তাদের কষ্ট হয় না ? নিশ্চয়ই হয়, শুধু আমরা বুঝতে পারি না নিজেদের ইচ্ছাপূর্তি করার জন্য ব্যস্ত থাকার কারণে।

রিনুর কুকুর পোষার ইচ্ছা যেন কোথায় হারিয়ে গেল। পরদিন সকালে উঠে রিনু বাবাকে বলল এক প্যাকেট বিস্কুট এনে দিতে। তার কারণটা রিনু কাউকে জানায়নি। বাবা এনে দিলে রিনু তা নিয়ে বাড়ির সামনে রাস্তায় গেল। তারপর একে একে প্যাকেট থেকে বিস্কুট বের করে কাদের যেন খেতে দিল। ও বাবা, প্রায় ছয় সাতটা কুকুর , ওদের পাড়াতেই থাকে।

সেদিন থেকে রিনু রোজ সকালে কুকুরগুলোকে নানারকম খাবার খেতে দেয়। এখন তো ওদের পাড়ার সব কুকুরই রিনুর কাছে আসে। রিনু ভাবে, কুকুর পুষলে তো একটা কুকুর হতো আর সেই কুকুরও দুঃখে থাকত। কিন্তু খাবার দিলে কত কুকুর আসে, আর কত আনন্দের অনুভূতিই না হয়।

রূপসা রায়, নবম শ্রেণী

পাহাড়-পর্বত

পাঞ্চেত পাহাড়

পাঞ্চেত পাহাড় পঞ্চকোট পাহাড় নামেও পরিচিত। পুরুলিয়া জেলার উত্তর-পূর্বে নেতুরিয়া ব্লকে অবস্থিত এই পাহাড়। অযোধ্যার পরেই পুরুলিয়ার এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পাহাড়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এটির উচ্চতা ২০১৭ ফুট। একসময় এই পাহাড় কাশীপুর মহারাজার দুর্গ হিসেবে ব্যবহার হতো। শত্রু মোকাবিলার এটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সেই কারণেই পাহাড়টি গড়পাঞ্চেত নামে পরিচিত। পাহাড়টিতে বিভিন্ন বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। পাঞ্চেত বাঁধ সংলগ্ন বিশাল জলাধার রয়েছে। বন বিভাগের তৈরি রাস্তা দিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় যাওয়া যায়। চূড়া থেকে পাহাড় ও বনাঞ্চলের মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। পাহাড়ের উপরে ও নীচে কয়েকটি প্রাচীন মন্দির রয়েছে।

এসো সংস্কৃত শিখি-৩৮

क्रियापदप्रयोग: –वर्तमानकाले (लट)

उत्तमपुरुषस्य एकवचनम्

अहम् गच्छामि। (পুং) আমি যাই।

अहम् गच्छामि। (স্ত্রী) আমি যাই।

অহ পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ দুই ক্ষেত্রেই হয়। —

अभ्यासं कुर्म:–१

अहम् आगच्छामि। আমি আসছি।

अहम् खादामि। अहम् पिबामि। अहम् पठामि। अहम् लिखामि। अहम् गायामि। अहम् वदामि।

प्रयोगं कुर्म: – এভাবে বাক্য তৈরি করতে হবে।

अहम् गच्छामि।

--- पश्यामि। --- खादामि। --- हसामि। —उत्तिष्ठामि।

বিশেষ দ্রষ্টব্য-খেয়াল করতে হবে, প্রথম পুরুষে যেমন ' **ति**' হয়েছিল, উত্তম পুরুষে '**मि**' হয়েছে।

ভালো কথা

বকের বন্ধুত্ব

আমাদের ছোট্টো ডোবাটির ধারে দুটো বক ছোটো ছোটো মাছ ধরার আশায় রোজই বসে থাকে। সেদিন মাছ ভেবে ঠোকর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোটো জলঢোড়া বকটিকে জড়িয়ে ধরে। এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছে যে বকটি আর উড়তে পারছিল না। পাড়েই ঘাসের উপর পড়ে বকটি হাঁসফাঁস করছিল। মাঝে মাঝে হুটোপুটি করছিল। আমরা দূর থেকে দেখছিলাম। হঠাৎ দূরে বসে থাকা বকটি উড়ে এসে ওদের খানিকক্ষণ দেখল। তারপর সাপটির মাথায় ঠোক্কর মারতে শুরু করল। বার কয়েক ঠোক্কর মারতেই সাপটি ওই বকটিকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। তারপর দুটো বকই উড়ে একটি গাছের ডালে গিয়ে বসল।

পূর্ণিমা সামন্ত, নবম শ্রেণী, ফারাক্কা, মুর্শিদাবাদ।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ন রি র্ত ব

(২) দ দ ল র

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) র কূ পা ল থা অ

(২) ধ ল ন অ বো কা

২৬ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) ফটিকজল (২) ফলনশীল

২৬ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) রজতজয়ন্তী (২) রাঘববোয়াল

উত্তরদাতার নাম

(১) শিবাংশী পাণিগ্রাহী, মকদমপুর, মালদা। (২) শ্রেষ্ঠা দত্ত, অভিরামপুর, পঃ মেদিনীপুর। (৩) শিবম রায়, রায়নগর, দঃ ২৪ পরগণা (৪) যুথিকা সরকার, গঙ্গারামপুর, দঃ দিনাজপুর।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

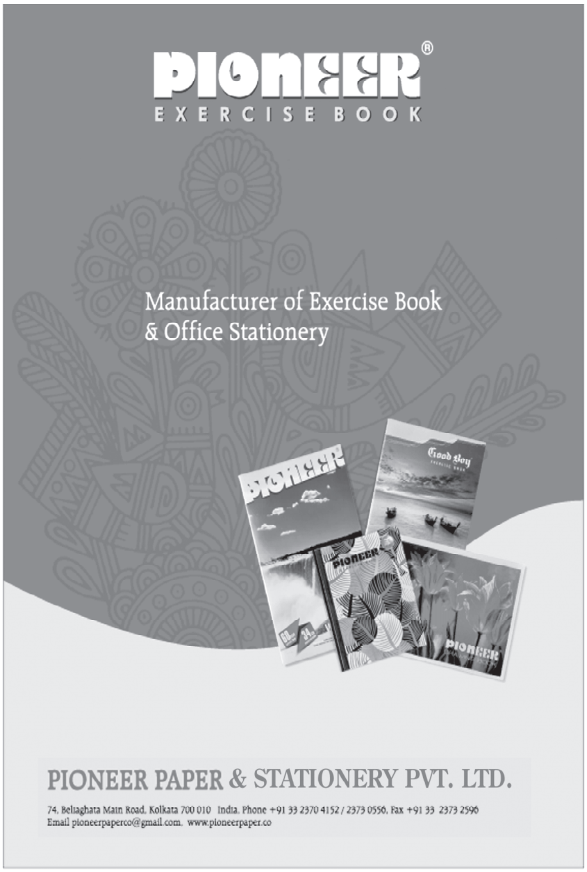

With Best Compliments from -

A

Well wisher

সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য স্বরূপ ও সমাধান

ড. শতরূপা চট্টোপাধ্যায়

“অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে পৃথিবীতে আজ।” মনে পড়ছে, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ভারী সুন্দর বলেছেন, “সকল প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে মাত্র একটিই বাঁচিয়া আছে। সেই অদ্বিতীয় গৌরবের স্থান ভারতীয় সভ্যতার।” ভারতীয় সভ্যতার একটি অন্তর্বর্তী স্থান সংস্কৃতির। এই সংস্কৃতির মধ্যে ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, স্থাপত্য যেমন স্থান অধিকার করে আছে, তেমন আচার-ব্যবহার, পোশাক পরিচ্ছদও গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিয়েছে। বহু ধর্ম, বর্ণ, জাতি ভাব ভাষার এক বিপুল সমাবেশ ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে লক্ষিত হয় যা কখনো দেশকে সমৃদ্ধ করেছে, কখনো আবার আবিলতায় কলুষিত করেছে। বর্তমান সমাজে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে এক অপসংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য দেখা যাচ্ছে। গোটা সমাজেই এই পদস্খলন। আমাদের সমাজে যাঁরা শীর্ষস্থানীয়, এই পচন ধরা পড়েছে সেখান থেকেই। কখনো আমরা পূজা অর্চনার ভুল মন্ত্র উচ্চারণ শুনি, কখনো অপশব্দ কটুবাক্যের অবিরাম প্রয়োগ দেখতে পাই। যে হিন্দুর পূজার্চনায় মন্ত্র ও বিধির শুদ্ধতা মূল মানদণ্ড ছিল, সেই আরাধনায় তারস্বরে এখন ডি জে বক্স বাজানো হয় বা কর্ণপটহ বিদারক চটুল কুরুচিকর গান। যে ঈশ্বরের আবাহন হয় বেদ পুরাণ বিহিত মন্ত্রের উদাত্ত কণ্ঠে, যে বিসর্জনের মন্ত্রে বলা হয়, ‘গচ্ছ দেবি মমান্তরম’ (দেবী, আমার হৃদয়ে গমন করে) বা ‘যা দেবী সোহমেব চ’ (সেই দেবীই স্বরূপত আমি), সেই দেবীর বিসর্জনের সময় অপসংস্কৃতির যে উচ্চকিত প্রকাশ দেখি আমরা তাতে লজ্জার অবধি থাকে না।

সর্বধর্মসমন্বয়ের নামে নির্লজ্জ সংখ্যালঘুতোষণের সংস্কৃতি চলছে পশ্চিমবঙ্গে! হিন্দু সংস্কৃতির কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে বহু বছর ধরে। শাঁখ বাজানো বা সরস্বতী পূজা বন্ধ, এমনকী মৃতদেহের পাশে হরিনাম করার সংস্কৃতি লুপ্ত হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের পাড়ায় পাড়ায়।

পিতৃপক্ষে দেবী দুর্গার পূজার সূচনা হয়ে যায় যা রীতিমতো অশাস্ত্রীয়। ঘট বিসর্জনের পরে দিনের পর দিন মূর্তির প্রদর্শনী হয় যা চূড়ান্ত অসংস্কৃত শিক্ষার বহিঃপ্রকাশ। ‘শুদ্ধব্রহ্মপরাৎপর’ রাম যিনি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের প্রাণপুরুষ, সেই মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরাম এখন নাকি ‘বহিরাগত’। পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে, দরিদ্রের প্রাসাদ থেকে রাজদরবার অবধি যে রামনামপ্রবাহ অভিষিক্ত করেছে বঙ্গের আকাশ-বাতাস-মাটি-জল-পাহাড়-নদী উপত্যকা প্রান্তর, সেই রামনাম এখন সমাজের এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের কাছে ব্রাত্য; মুক্তিপ্রদ রামনাম উষ্মা ও ভীতির কারণ। এর চেয়ে বড়ো সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য কী হতে পারে! সর্বধর্মসমন্বয়ের নামে নির্লজ্জ সংখ্যালঘুতোষণের সংস্কৃতি চলছে পশ্চিমবঙ্গে! হিন্দু সংস্কৃতির কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে বহু বছর ধরে। শাঁখ বাজানো বা সরস্বতী পূজা বন্ধ, এমনকী মৃতদেহের পাশে হরিনাম করার সংস্কৃতি লুপ্ত হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের পাড়ায় পাড়ায়। তুলসীপূজা নয়, ক্রিসমাস ট্রি আলোকিত করার বিদেশি সংস্কৃতি জেগে উঠেছে। এখন আমরা গোপাল সেজে রাখিবন্ধন করি না, ঝুলনের উৎসবে মাতি না, সান্তাক্লস সেজে সঙ্ সাজার প্রতিযোগিতায় নামি। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে ধানদূর্বা দিয়ে আয়ু ও যশ বৃদ্ধির আশীর্বাদ নিয়ে জন্মদিন পালনের বৈদেশিক সংস্কৃতি আত্মসাৎ করেছি আমরা বহুদিন আগেই।

শুধু ধর্মীয় সংস্কৃতির নৈরাজ্য নয়, বর্তমান সমাজ দেখেছে, বিদ্যালয়ে শিক্ষক হেনস্থা, এমনকী তাঁদের প্রহারের ঘটনাও প্রত্যক্ষ হচ্ছে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষক বা উপাচার্য ঘেরাও (এই ‘ঘেরাও’ শব্দটির সম্প্রতি ইংলিশ ডিকশেনারিতেও অনুপ্রবেশ ঘটেছে) নিত্যদিনের ঘটনা। যাঁরা সমাজকে আলোকিত করার লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষকতায় মতো মহান পেশায় প্রবেশ করেছেন, বেলাগাম অভিযোগে তাঁরাও ছাড় পাননি। অবাধে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে চাকরি কেনা-বেচা চলছে। ফাঁকা উত্তরপত্র বা blank OMR SHEET জমা দিয়েও

ফঃ ৬

একশ্রেণীর অসাধু শিক্ষক যোগ্য প্রার্থীদের পিছনে ফেলে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন। কী শিখবে পরবর্তী প্রজন্ম এইসব অসাধু মাস্টারমশাইদের থেকে! আর এর পিছনে যে দুষ্টচক্র তাকে কিছুতেই উৎখাত করা যাচ্ছে না। যেসময় এই লেখা চলছে, চারিদিকে 'Justice for RG Kar' স্লোগান উঠছে বিপুল উত্তেজনায়। তার কারণ আমরা সকলেই এখন জানি। এক প্রতিভাময়ী তরুণী ডাক্তারকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে আরজি কর হাসপাতালের মধ্যেই। শুধু তাই নয়, ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে প্রমাণ নষ্ট করার সন্দেহ চাগাড় দিয়েছে।

অন্যদিকে অপরাধীদের শনাক্ত করার কোনো উপায় নেই, তাদের লুকিয়ে ফেলার স্পর্ধা, আচরণ লজ্জায় ফেলবে এক শিশুকেও। প্রকৃত দোষীকে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে, তদন্তও চলছে। কিন্তু এরই মাঝে মাঝে উঠে আসছে তথাকথিত শিক্ষিত ডিগ্রিধারী লোকেদের এক নোংরা কদর্য মানসিকতার প্রতিচ্ছবি। কোথায় গেল কুমারীপূজার অপূর্ব হিন্দু সংস্কৃতি থেকে সব নারীর মধ্যে দেবীকে দর্শন করার শিক্ষা নেওয়ার মানসিকতা? শ্রীশ্রী চণ্ডীর মন্ত্রে পাই, 'সমস্ত স্ত্রী দেবীরূপিণী'। কোথায় গেল সনাতন ধর্মের এই গৌরবময় সংস্কৃতি যেখানে কুন্তী, বিদুলা, মদালসার মতো মায়েরা সন্তানকে ছোট্ট থেকে সুসন্তানরূপে লালিত পালিত করে সমাজ ও দেশের কাজে উৎসর্গ করতে প্রাণিত করছেন। সন্তান গর্ভে থাকাকালীন সুনীতি— কয়াধুর মতো ব্রতী হবে ধর্মচর্চায়, তবেই না ধ্রুব প্রহ্লাদের মতো বালক লালিত পালিত বিকশিত হবে ভারতমাতার অঞ্চলছায়ায়! নিভৃতে আবরণের আড়ালে দেবতার ভোগ হিন্দুর সংস্কৃতি, এখন কিন্তু ঘটা করে ভোগের থালা, নৈবেদ্য সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ না করলে স্ট্যাটাস থাকে না! জামাই ষষ্ঠী থেকে জন্মদিন, সমাজের নতুন সংস্কৃতিতে এখন ব্যক্তিগত মুহূর্ত বলে কিছু নেই, সবটাই 'পাবলিক', প্রকাশযোগ্য।

হিন্দু সংস্কৃতি বলে, পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব, আচার্য দেবো ভব, অতিথি দেবো ভব। এখন কিন্তু পিতা-মাতা সংসারের বাড়তি জন, বাড়িতে আত্মীয় পরিজন বন্ধু এলেও বিরক্ত হই আমরা, অতিথি আগমনে দেবভাব আরোপ করা তো অনেক দূরের কথা। Father's day, Mother's day, Valentine's day, friendship day— সমাজ সংস্কৃতির বড়ো আপন উদ্‌যাপন আজ। সত্যই সাংস্কৃতিক নৈরাজ্যের চরমসীমায় উপনীত আমরা! ভারতবর্ষ শিখিয়েছে, 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'— বিদ্যা মুক্তি দেয়— অন্ধকার থেকে, দৈন্য থেকে, পীড়া থেকে, গ্লানি থেকে মুক্ত করে। শিক্ষার আশ্রয়ে যে সংস্কৃতি বেঁচে থাকে, লালিত হয় সেই সংস্কৃতি আমাদের উন্মুক্ত আকাশের আশ্রয়ে বাঁচতে শেখায়। কিন্তু এ কোন শিক্ষা! সত্যিই সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য cultural anarchy চলছে এই পশ্চিমবঙ্গে সারা দেশের কাছে, পৃথিবীর কাছে আমরা লজ্জিত পীড়িত সংকুচিত।

Culture and Anarchy : An Essay in Political and Social Criticism —সংস্কৃতি ও নৈরাজ্য : রাজনৈতিক ও সামাজিক সমালোচনায় একটি প্রবন্ধ হলো ম্যাথিউ আর্নল্ডের একটি সাময়িক প্রবন্ধের একটি সিরিজ, যা প্রথম ১৮৬৭-৬৮ সালে কর্নহিল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল এবং ১৮৬৯ সালে একটি বই হিসেবে সংগৃহীত হয়েছিল। তাঁর মতে, 'সংস্কৃতি হলো পরিপূর্ণতার অধ্যয়ন'। তিনি আরও লিখেছেন, '(সংস্কৃতি) বিশ্বের সর্বত্র যা ভাবা এবং পরিচিত হয়েছে তা সর্বোত্তম করতে; সমস্ত মানুষকে মাধুর্য ও আলোর পরিবেশে বাস করতে 'Culture is a study of perfection...seeks to do away with classes; to make the best that has been thought and known in the world current everywhere; to make all men live in an atmosphere of sweetness and light.' সংস্কৃতি ও অরাজকতায়, ম্যাথিউ আর্নল্ড যুক্তি দেন যে সংস্কৃতি একটি আদর্শ এবং যৌথ সাধনা। যেখানে সব মানুষ মাধুর্য ও আলোর পরিসরে বেঁচে থাকবে, সেটিই কৃষ্টি। শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের মূল ভাবনা, Perfection is God. আমাদের জীবনের লক্ষ্য কী! এই পরিপূর্ণতার প্রতি নিরন্তর এগিয়ে চলা। আমাদের সব ত্রুটি বিচ্যুতির একটাই উদ্দেশ্য, আরোহণ অবরোহণের পথ উজিয়ে পূর্ণত্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সংস্কৃতি চর্চা সেটা নন্দনতত্ত্বর পরিশীলিত পরিসরে হতে পারে, আবার দেশের সনাতন আদর্শের নিয়মিত অনুশীলনেও কার্যকরী হতে পারে। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপট অপসংস্কৃতির ধারক বাহক পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠছে। আর এই ক্রমবর্ধমান সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য যে কোনো বিবেকবান মানুষের থেকে হরণ করছে তার সুখ, শান্তি, জীবনযাপনের মাধুরী।

তবে আশা হারানো পাপ। সমাধানসূত্র নির্ণয় করতেই হবে। যথাবিধি শাস্ত্ররাজি বেদ পুরাণ গীতা উপনিষদের চর্চায় মনোনিবেশ করতে হবে, তার সঙ্গে শস্ত্রচর্চায়ও যুক্ত হতে হবে--- শাস্ত্র ও শস্ত্র দুইয়ে মিলেই ভারতবর্ষের সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন সম্ভব। প্রতিটি বাড়ি সমাজের এক একটি 'একক'। তাই ঘরে ঘরে হিন্দুর সনাতন সংস্কৃতির বিপুল উৎসাহে শুদ্ধ যাপন একান্ত প্রয়োজন। সনাতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ মঠ মন্দিরগুলির সঙ্গে সাধারণ সংসারী মানুষের মেলবন্ধন প্রয়োজন, নয়তো ভারতবর্ষের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের মণিকাঞ্চনযোগ সম্ভবপর হবে না। জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলিকে heart to heart, door to door কাজ করতে হবে। হিন্দু সংস্কৃতির মূল তত্ত্বকে কঠিন পারিভাষিক শব্দে আবদ্ধ না রেখে সহজ সুললিত করে পরিবেশন করতে হবে, বিশেষ করে মাতৃমণ্ডলীকে। একজন সংস্কৃতিবান মা শত সন্তানকে যথার্থ মানুষ করতে পারেন। একদিন এই নৈরাজ্যর অন্ত হবে ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্য ও পারম্পরিক গরিমার শীলনেই— এই প্রত্যয় নিয়ে বাঁচবো আমরা।

(লেখক অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা, RCCIIT, কলকাতা)

With Best Compliments from -

A Well Wisher

বামপন্থী-সহ বিরোধীরা এনডিএ সরকার ফেলার নোংরা খেলা চালিয়েও সফল হবে না

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

উওক কালচারে অভ্যস্ত দেশি-বিদেশি, ভারত তথা হিন্দু-বিরোধী বামপন্থীরা স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশেষ পর্যায় থেকে স্বাধীনোত্তর ভারতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত অবদমিত হিন্দু সমাজের নবজাগরণে শঙ্কিত ছিল। লোকসভা ভোটের বহু আগে থেকে তাদের পিছনে কিছু বিদেশি শক্তি কয়েক বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে যাতে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় না আসে। কিন্তু তা যখন রোখা গেল না তখন এই উন্মাদ গোষ্ঠী নবনির্বাচিত এনডিএ সরকারকে ফেলার চেষ্টা করছে।

উওক হলো আফ্রিকান-আমেরিকান ভার্নাকুলার ইংরেজি থেকে উদ্ভুত এক রাজনৈতিক অপবাদমূলক বিশেষণ। এটা মূলত বর্ণগত কুসংস্কার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে একটি সতর্কতা। ২০১০ দশকের শুরুতে, এটা জাতিগত অবিচার, লিঙ্গবাদ এবং এলজিবিটিদের অধিকার অস্বীকারের মতো সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে বৃহত্তর সচেতনতা সৃষ্টির জন্য তৈরি করা হয়েছিল। আসলে কিন্তু পুরোটাই আরেক ধাপ্পা। সমাজে অরাজকতা সৃষ্টির একটা চক্রান্ত।

তাই এখন দুই দিকে প্রচেষ্টা চলছে— এনডিএ-তে বিজেপির মিত্রদের মধ্যে 'FUD' বপন করার চেষ্টা করো,

জর্জ সোরোস

(FUD-এর ফুল ফর্ম হলো— ফিয়ার— ভয়, আনসার্টেন্টি — অনিশ্চয়তা এবং ডাউট— সন্দেহ। এটা হলো বিক্রয়, বিপণন, জনসম্পর্ক, রাজনীতি, ভোটদান এবং সংস্কৃতিতে ব্যবহৃত একটি ম্যানিপুলেটিভ ও প্রোপাগান্ডা-ধর্মী কৌশল) এবং এনডিএ সরকারের পতন নিশ্চিত করার জন্য অবাধ হিংসা, নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করো। ওই অ্যাকশন আইটেমের অংশরূপে তথাকথিত 'সাংবাদিকরা' কখনও প্রকাশ্যে বলছে যে মোদীর সহযোগীরা 'দুর্বল'। কখনো-বা তারা প্রচার করছে যে তারা 'বিজেপির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে'।

অন্য অ্যাকশন আইটেম হলো, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা। এখানেই রাহুল গান্ধীকে কাজে লাগে এবং এখানে ইন্ডি জোটের অন্য পরিবারবাদী জোটসঙ্গীরা ততটা কাজে লাগে না। অখিলেশ যাদব-সহ এই জোটসঙ্গীদের অনেকেই তাদের রাজ্যের বাইরে যাওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। যতদিন আঞ্চলিক ক্ষমতা তাদের হাতে থাকে ততদিন

তারা বেশ সন্তুষ্ট। ডিএমকে-র মতো দলগুলো জানে যে তারা তাদের দুর্গের বাইরে একটি বা দুটি আসনও পাবে না, প্যান-দ্রাবিড় মতাদর্শ বা অন্যান্য রাজ্যে নামমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদির কথা বলা সত্ত্বেও। এমনকী কেজরিও একটা মাত্র রাজ্যের 'বিস্ময়'-এ পরিণত হয়েছে। তাদের সর্বোচ্চ আশা ছিল ৬০টা আসন কংগ্রেস পাবে, তবে ইন্ডি জোট সমবেতভাবে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে এবং তাদের কিছু জোটসঙ্গী ৩০-৪০টা আসন পাবে। তখন বেশি আসন পাওয়া দল থেকে প্রধানমন্ত্রী পদ দাবি করবে নতুবা এনডিএ-তে যাওয়ার হুমকি দেবে। যদিও তা ঘটেনি, সম্ভবত ২০২৯ সালেও ঘটবে না।

এই কারণে ভারতে এবং পশ্চিমি দেশের বামপন্থী ইকোসিস্টেম রাহুল গান্ধীর উপর তাদের সমস্ত বাজি ধরেছে। রাহুল গান্ধীকে জাতীয়স্তরে সফল নেতা হিসেবে প্রতিপন্ন করতে যে অস্ত্র তারা প্রয়োগ করেছে, সেই একই অস্ত্র এই মুহূর্তে তারা ভারতের অন্য রাজ্যে বা ইন্ডিজোটের অন্য দলগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যাপারে হয়তো অনিচ্ছুক।

রাহুল গান্ধীকে দিয়ে এই বিদেশি শক্তিগুলির ৯০ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যে আঙুল না বেঁকিয়েই সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য পরিবারবাদী দলের কেউই বিশেষ করে অখিলেশ, তেজস্বী, এমনকী এম কে স্টালিন বা উদ্ধব ঠাকরে ও মমতা ব্যানার্জিরা— নির্ভরযোগ্যভাবে উওক বা 'জাগ্রত বামপন্থী' নন। তারা কেবল আঞ্চলিক মস্তান যাদের মধ্যে মতাদর্শ বলে কিছু নেই। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, রাহুল শরীরী ভাষায় ও বচনে যে হিন্দুবিদ্বেষ প্রদর্শন করে, তার অন্য জোট শরিকরা ভোটের কারণে হিন্দুধর্মের প্রতি প্রকাশ্যে ততোটা ঘৃণা প্রদর্শন করতে পারে না।

যদিও ডিএমকে প্রবল হিন্দু বিরোধী, কিছু ক্ষেত্রে রাহুলের চেয়েও বেশি। তামিলনাড়ুতে রাজনৈতিক প্রহসন একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার। বস্তুত রাজ্যে ক্ষমতায় থাকলে ডিএমকে অন্য কিছুকে পাত্তা দেয় না। অতীতে কপালে ভস্ম বা বিভূতি লাগালে দল থেকে বহিষ্কার করা হতো, এখন হয় না। অনেক ডিএমকে কর্মী ও নেতা প্রকাশ্যে তা লাগায়। ডিএমকে তামিল রাজনীতির অঙ্ক বোঝে এবং তাদের সীমানা অতিক্রম করে না। বামেরাও এটা জানে। তদুপরি, ডিএমকে-র প্রধান করুণানিধির পরিবার বেশ কয়েকটি বড়ো ব্যবসা পরিচালনা করে। তাই তাদের বাদ দিতে হবে। রাহুল আদানি-আম্বানি নিয়ে একাই বকে চলে, যদিও ইন্ডিজোটের অনেকে প্রকাশ্য আক্রমণের সেই লাইন থেকে সরে গেছে।

বামেদের কাছে রাহুল গান্ধীর ভাবভঙ্গী এক বিশাল সুবিধা দেয়। যদিও তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব প্রায় শেষ। সনাতন ধর্মের সম্পূর্ণ ধ্বংস হলো বামপন্থীদের লক্ষ্য, স্ট্যালিন ও মাওয়ের বর্বর মতাদর্শ ভারতে চাপিয়ে দেওয়া যার পূর্বশর্ত। এটা 'দক্ষিণ এশিয়া'য় বেজিঙের মতলবপূরণের (অর্থাৎ কমিউনিজমের নামে স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা) এক গুরুত্বপূর্ণ অংশও। হিন্দুধর্মের ডিএনএ গণতান্ত্রিক এবং তাই তারা অ্যান্টি-কমিউনিস্ট। কমিউনিস্টরা কিছুতেই তাদের লক্ষ্যে আপোশ করবে না এবং তাদের উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক নয় এমন কোনো যুবরাজের পিছনে অযথা সময় নষ্ট করবে না। গ্লোবাল 'উওক'রা হিন্দু গণহত্যায় উৎসাহী। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ভারতীয় সভ্যতা ধ্বংস। তাদের নিজেদের দেশে ইসলামপন্থী জেহাদিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে তারা একটা সাজানো লড়াই লড়ছে।

এই কারণেই বামপন্থী ইকোসিস্টেম রাহুল গান্ধীর প্রশংসা করছে, এমনকী ইন্ডি জোটের অংশীদার অন্যান্য পরিবারবাদীদের বিরোধিতা বা উপেক্ষা করার মূল্যেও রাহুলকে সর্বজয়ী সুপার হিরোতে পরিণত করার চেষ্টা করছে। রাহুল এদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এবং এই ট্রেন্ডটি গত জুনের পরে আরও প্রবল হয়েছে। সম্প্রতি একজন বামপন্থী মরাল ভিকট্রির (নৈতিক জয়ের) অলীক তত্ত্ব আউড়ে হাসির খোরাক হয়ে ঘোষণা করেছেন যে রাহুল 'প্রায় জয়ী' হয়েছেন।

একটি বিষয় যা ভারতের পক্ষে সহায়ক হতে পারে তা হলো বাইডেনের ক্রমবর্ধমান ডিমেনশিয়া, যা আর ঢেকে রাখা যাচ্ছে না। এটা ডেমোক্র্যাটদের পরাজয়ের প্রবল সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এই মুহূর্তে, পুরো 'উওক' ইকোসিস্টেমটি এটা নিশ্চিত করার দিকে মনোনিবেশ করছে যাতে আসন্ন নির্বাচনে মার্কিন ভোটাররা ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বিরুদ্ধে না যান। নিউ ইয়র্ক টাইমস ও অন্যরা ইতিমধ্যেই নানা খবর চেপে দিয়েছে। গত ৪ জুলাই সন্ধ্যার বিতর্ক সভা পর্যন্ত বাইডেন পুরোপুরি স্বাভাবিক ছিলেন বলে তারা প্রচার করছে। এর মাঝে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর গুলি চললেও ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে গিয়েছেন। আন্তর্জাতিক গুপ্ত চক্রীদল বা ক্যাবাল এখন ১০০ শতাংশ ফোকাস লাগিয়ে কাজ করবে যাতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে ট্রাম্প ফিরে না আসেন। একই রকমভাবে যত টাকা ও ব্যান্ডউইড্‌থ লাগুক না কেন, ভারতে ক্ষমতাসীন এনডিএ সরকারকে ফেলে দিয়ে এক স্থূলবুদ্ধির রাজপুত্রকেও যদি সিংহাসনে বসানো যায় সেই লক্ষ্যে তারা কাজ করে চলেছে। রাহুল এখন পুরোপুরি বাম, বিশেষত অতিবাম নৈরাজ্যবাদী নকশাল গোষ্ঠীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ও পরিচালিত, কারণ তিনি একা এত বড়ো 'নেটওয়ার্ক' চালাতে অক্ষম, তার সে বুদ্ধিও নেই, জনসমর্থনও তলানিতে। আবার অন্যদিকে বামেরা রাজনৈতিকভাবে পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। এখন রাহুল গান্ধীর কংগ্রেস ছাড়া তারা অক্সিজেন পাবে না— ও তাদের এক অদ্ভুত সিম্বায়োটিক সম্পর্ক। একই রকম ভাবে পশ্চিমবঙ্গের বড়ো সংবাদগোষ্ঠীগুলিও বর্তমানে প্রাক্তন নকশালদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। □

With Best Compliments from -

A Well Wisher

বাংলাদেশে শিক্ষাঙ্গন থেকে হিন্দু শিক্ষকদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করে ভারতে চলে যাওয়ার পর হিন্দুদের ওপর ব্যাপক হামলার পাশাপাশি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংখ্যালঘু শিক্ষকদের পদত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি খানসেনা বাহিনীর সহযোগী মুসলিম লিগ নেতা এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে সেনাশাসক জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত বিএনপির অন্যতম শীর্ষ নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী প্রায়ই বলতেন, 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেদিকে তাকাই সব 'বাবু'রাই দখল করে আছে।' ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর যুদ্ধাপরাধের দায়ে জামায়াতে ইসলামির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীরও ফাঁসি হয়। সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী নেই, কিন্তু জঙ্গি-আন্দোলনে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর তার সেই ইচ্ছা কার্যকর হতে শুরু করেছে। সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে কিংবা ভয় দেখিয়ে সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দু শিক্ষকদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, পদত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে। কোনো কোনো শিক্ষক পদত্যাগে রাজি না হলে তাদের বাড়িঘরে হামলা ও লুটপাট করা হচ্ছে। সংবাদমাধ্যম এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন সূত্রে এসব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এখানে আংশিক তালিকা তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) উপাচার্য অধ্যাপক ড. সত্যপ্রসাদ মজুমদার অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়াতে পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মিহির রঞ্জন হালদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য সীতেশ চন্দ্র বাছার, কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. বেনু কুমার দে, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. অলোক কুমার পাল, রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কাঞ্চন চাকমা, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক অমিত রায়চৌধুরী।

পদত্যাগ করতে হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর ড. লিটন কুমার সাহা ও ড. সঞ্চিত গুহ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর অমিত দত্ত, পরিবহণ প্রশাসক ড. স্বপন চন্দ্র মজুমদার, রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. নিখিল চাকমা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর ড. পুরঞ্জিত মহলদার, আবাসিক শিক্ষক সুরেন কুমার ও দিলীপ কুমার, জনসংযোগ প্রশাসক ড. প্রণব কুমার পাণ্ডে, ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. দীপিকা রানি সরকার, জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ সালাম বরকত হলের প্রাধ্যক্ষ সুকল্যাণ কুণ্ডু, দিনাজপুরে হাজী মহম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক ড. শ্রীপতি শিকদার, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসইর পরিচালক অধ্যাপক ড. বিকাশ চন্দ্র সরকার, রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু হলের পরিচালক বিজন মোহন চাকি, ঢাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন প্রশাসক অধ্যাপক ড. সিদ্ধার্থ ভৌমিক, নোয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক বিপ্লব মল্লিক এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রাধ্যক্ষ অবন্তী বড়ুয়া।

পদত্যাগ করেছেন খুলনার গাজী মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাঃ বঙ্গ কমল বসু, দিনাজপুর এম আবদুর রহিম মেডিক্যাল কলেজের এনাটমী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ কান্তা রায় মিমি, আনোয়ার খান মর্ডার্ন নার্সিং কলেজের অধ্যক্ষ ড. তাপসী ভট্টাচার্য, বারডেম নার্সিং কলেজের অধ্যক্ষ দীপন দত্ত, ফেনী নার্সিং কলেজের অধ্যক্ষ বিউটি মজুমদার, জহুরুল হক নার্সিং কলেজের অধ্যক্ষ আলপনা বিশ্বাস, হলি ফ্যামিলি নার্সিং কলেজের সহকারী অধ্যাপক সোনালী রানি দাশ, মাদারীপুর নার্সিং ইনস্টিটিউটের ধরিত্রী ও প্রদীপ।

সরিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজধানীর খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিরপুর অ্যাকাডেমি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শুভাশিস বিশ্বাস সাধনকে। তিনি গত বছর সারা বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন। পদত্যাগ করতে হয়েছে ঠাকুরগাঁও পুলিশ লাইন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ভবেশ চন্দ্র রায়, খুলনার কপোতাক্ষ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অদ্রীশ আদিত্য মণ্ডল, ঢাকার ভিকারুন নেছা স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কেকা রায় চৌধুরী, ঢাকার আজিমপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ গীতাঞ্জলি বড়ুয়া, খান সাহেব কমরউদ্দিন কলেজের অধ্যক্ষ ড. চয়ন কুমার রায়, মণিরামপুর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ কুমার, চট্টগ্রাম কলেজের উপাধ্যক্ষ সুব্রত বিকাশ বড়ুয়া, রসায়ন বিভাগের প্রধান ড. কনক কুমার বড়ুয়া, সহকারী অধ্যাপক ড. বাবুল চন্দ্র নাথ, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক অর্পণ কুমার চৌধুরী ও দর্শন বিভাগের অধ্যাপক কৃষ্ণা বড়ুয়া, সেতাবগঞ্জ সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুবোধ চন্দ্র রায়, চাঁদপুর পুরান বাজার ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ রতন কুমার মজুমদার, ঝিনাইদহ কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের পদার্থবিদ্যার শিক্ষক কাঞ্চন কুমার বিশ্বাস, ঢাকার আজিমপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক গৌতম চন্দ্র পাল, পাবনার সাঁথিয়া মডেল স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক বিজয় কুমার দেবনাথ, কালিয়াকৈরের আশরাফ আলি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাধাগোবিন্দ, নারায়ণগঞ্জের বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক উত্তম কুমার সাহা, ঘাগরিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনুপম মহাজন, কুমিল্লার দিদার মডেল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাদেব চন্দ্র দে, সেতাবগঞ্জ সরকারি কলেজের অফিস সরকারি নির্মল চন্দ্র রায়।

বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতের দিকে নজর বিশ্বের পোশাক নির্মাণ সংস্থাগুলির

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব দেখা দিয়েছে তাদের শিল্প তথা অর্থনীতির উপর। বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের উপর নির্ভরশীল বহু আন্তর্জাতিক পোশাক নির্মাণ সংস্থা ক্রমশ নিজেদের সেখান থেকে সরিয়ে আনছে। বাংলাদেশে প্রধানত স্টিচিঙের কাজটাই করা হয়। অন্যান্য দেশের তুলনায় সে দেশে শ্রমিক খরচ অনেক কম হওয়ায় বহু আন্তর্জাতিক পোশাক সংস্থার পছন্দের তালিকার প্রথমের দিকে ছিল তারা। সম্প্রতি সেই দেশের

অস্থিরতা দেখে অধিকাংশ সংস্থারই নজর এখন ভারতের দিকে। ভারতে স্টিচিঙের সঙ্গে ফ্যাব্রিকের কাজটাও হয় যা বাংলাদেশে ঘাটতি ছিল। ভারতের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের দেওয়া পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, বিগত অর্থবর্ষের প্রথম তিন মাসে টেক্সটাইল রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৮.৪৩ বিলিয়ন ইউএস ডলার, যা বর্তমান অর্থবর্ষে ৮.৭৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার। আন্তর্জাতিক বাজারে কাপড়ের ঘাটতি মেটাতে সারা বিশ্বের কাছে বড় বিকল্প ভারত। তাই আগামীতে এই ক্ষেত্রে ভারতের উল্লেখযোগ্য উন্নতির সুযোগ রয়েছে।

ঢাকায় জঙ্গিমুক্তিতে উদ্বেগ কেন্দ্রের সতর্কবার্তা সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশের জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে অনসারুল্লাহ বাংলা টিম বা এবিটি-র প্রধান জসিমুদ্দিন রহমানিকে। ভারতীয় গোয়েন্দাদের মতে এই সংস্থার সঙ্গে আল-কায়দা, লস্কর-ই-তৈবা প্রভৃতি জঙ্গি সংগঠনের যোগাযোগ রয়েছে। সাম্প্রতিক অসম, ত্রিপুরা থেকে এবিটির সদস্য ধরা পড়ে। পশ্চিমবঙ্গেও তাদের সক্রিয়তা রয়েছে। এমতাবস্থায় জঙ্গি মুক্তির ঘটনা সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর আগেও সীমান্তবর্তী এলাকার মাদ্রাসাগুলিতে জঙ্গি কার্যকলাপের ক্ষেত্রে এবিটির হস্তক্ষেপের অভিযোগ রয়েছে। তাই বাংলাদেশের বর্তমান অস্থিরতার পরিবেশ আরও গাঢ় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কও বিঘ্নিত হবে।

শোক-সংবাদ

হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার ধুলাগড়ী গ্রামের পণ্ডিতপাড়া শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক তারক পণ্ডিত গত ২৯ জুলাই পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি ৫ পুত্র, ৪ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গিয়েছেন।

ভারতজুড়ে ট্রেনে নাশকতা, হিন্দু নেতাদের খুনের ছক : প্রকাশ্যে কুখ্যাত জঙ্গির ভিডিয়ো বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ব্যাঙ্গালোরের রামেশ্বরম কাফেতে বিস্ফোরণে আহত হয়েছিলেন ১০ জন। এই ঘটনার মূলচক্রী ফারহাতুল্লা ঘোরি এবার সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো বার্তায় ভারতজুড়ে ট্রেনে জঙ্গি হামলার হুমকি দিল। এই বিষয়ে সতর্কবার্তা জারি করেছে ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ। উল্লেখ্য, পলাতক সন্ত্রাসবাদী ঘোরি বর্তমানে পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়েছে। গত ১ মার্চ আইএসআইয়ের সাহায্যে ব্যাঙ্গালোরের ওই কাফেতে হামলা চালিয়েছিল সে। ভারতীয় গোয়েন্দাদের 'মোস্ট ওয়ান্টেড' তালিকায় থাকা এই জঙ্গি সম্প্রতি এক ভিডিয়ো বার্তায় আত্মগোপন করে থাকা জেহাদিদের ফের সক্রিয় হতে আহ্বান জানিয়েছে। দেশের রেলপথে নাশকতা ছড়াতে প্রেশার কুকার-সহ বিভিন্ন ধরনের বোমা ব্যবহার করতে বলেছে ঘোরি। এছাড়াও তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের পেট্রোলিয়াম পাইপলাইনে নাশকতা ছড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে এই কুখ্যাত জেহাদি। ভারতের হিন্দু রাজনৈতিক নেতাদের খুনেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভিডিয়ো বার্তায় দলের জঙ্গিদের সতর্ক করে ঘোরি জানিয়েছে যে এনআইএ এবং ইডি 'স্লিপার সেল'কে টার্গেট করছে। এরপর তাকে বলতে শোনা যায়— 'যদিও পালটা হামলায় আমরাও ওদের কাঁপিয়ে দেবো'। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, গত আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে এই ভিডিয়োটি টেলিগ্রামে পোস্ট করা হয়। প্রসঙ্গত, গত ১ মার্চ ব্যাঙ্গালোরের রামেশ্বরম কাফেতে বিস্ফোরণ হয়।

এই ঘটনায় আহত হন ১০ জন। অভিযুক্ত মুসাভির হুসেন শাজিব এবং তার সহযোগী আবদুল মতিন তাহা— কর্ণাটকের শিবমোগার তীর্থাহাল্লির বাসিন্দা বলে জানতে পারে এনআইএ। দুই জঙ্গি এরপর পশ্চিমবঙ্গে গা ঢাকা দিয়েছিল। পরে কাঁথি থেকে এনআইএ-র জালে ধরা পড়ে ওই দুই অভিযুক্ত। এবার ঘোরির ভিডিয়ো বার্তা প্রকাশ্যে আসার পর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের তরফে সতর্ক করা হচ্ছে সব রাজ্যকে।

প্যারিসে অনুষ্ঠিত প্যারালিম্পিক গেমসে ভারতীয় প্রতিযোগীদের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে প্যারালিম্পিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ভারতীয়রা সাফল্য অর্জন করেছেন। ২০২০ সালে টোকিয়ো প্যারালিম্পিক গেমসে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন ভারতীয় প্যারালিম্পিক স্পোর্টস শুটার অবনী লেখারা। প্যারিস প্যারালিম্পিক গেমসে অংশ নিয়ে গত ৩০ আগস্ট মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিং এসএইচ-১ ইভেন্টের

ফাইনালে আরও একবার স্বর্ণপদক অর্জন করলেন অবনী। একই সঙ্গে সৃষ্টি করলেন বিশ্ব রেকর্ড। ইউক্রেনীয় প্যারালিম্পিক স্পোর্টস্ শুটার ইরিনা শেটনিক ও তাঁর ভারতীয় সহ-প্রতিযোগী মোনা আগরওয়ালকে প্রতিযোগিতায় পিছনে ফেলে ২০২০ সালে সোনা জেতেন অবনী।

এই বছর প্যারালিম্পিক্সে আয়োজিত ইভেন্টে দুই রাউন্ড স্থায়ী স্টেজ ওয়ানে মোট ১০৩.৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করেন অবনী। পারফরম্যান্সের গ্রাফ শীর্ষে নিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় স্টেজে পদক জয়ের লড়াইতে ফেরেন অবনী। সেই স্টেজে তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছিলেন আরেক ভারতীয় প্যারা-শুটার মোনা আগরওয়াল। মোনার সঙ্গে ব্যবধান ধরে রেখে এই স্টেজে প্রথম স্থানে পৌঁছে যান অবনী। এই স্টেজের শেষে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার প্যারা-শুটার ইউনরি লী। শেষ রাউন্ডের প্রথম পর্যায়ে অবনীর শট সংগ্রহ করে ৯.৯ পয়েন্ট। ইউনরি পান ১০.৭ পয়েন্ট। সবাই যখন ভাবছিলেন যে অবনী হয়তো দ্বিতীয় স্থানে থেকে রৌপ্য পদক পেতে চলেছেন, সেই সময় একটি শটে অবনী পান ১০.৫ পয়েন্ট। প্রবল চাপের মুখে তাঁর শটে ইউনরি পান মাত্র ৬.৮ পয়েন্ট। টোকিয়োর তুলনায় এইবার ০.১ পয়েন্ট বেশি পেয়ে— ২৪৯.৭ পয়েন্টের নতুন সেরা স্কোর-সহ অবনী টপকে গেলেন নিজের পূর্ববর্তী প্যারালিম্পিক রেকর্ড। এই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জেতেন ভারতীয় প্যারা-শুটার মোনা আগরওয়াল। নিজের পারফরম্যান্সের গুণে অবনী হয়ে উঠলেন প্যারিস প্যারালিম্পিক্সে ভারতের তরফে প্রথম স্বর্ণপদক-জয়ী প্যারা- শুটার।

প্যারালিম্পিক্সে অংশগ্রহণ শুরুর পর থেকে এবার নিজেদের সবচেয়ে বড়ো দল পাঠিয়েছে ভারত। প্যারিস প্যারা গেমস থেকে ভারতকে তৃতীয় পদক এনে দেন প্রীতি পাল। মহিলাদের দৌড় প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার টি-৩৫ ফাইনালে উঠেছিলেন ভারতীয় প্যারা-অ্যাথলিট প্রীতি পাল। প্যারিস প্যারালিম্পিক্সে অ্যাথলেটিক্সে দেশকে দু'টি পদক এনে দিয়েছেন প্রীতি। গত ৩০ আগস্ট মেয়েদের ১০০ মিটার টি-৩৫ ফাইনালে ১৪.২১ সেকেন্ডে রেস শেষ করে ব্রোঞ্জ পদক জয় করেন প্রীতি। গত ১ সেপ্টেম্বর মেয়েদের ২০০ মিটার টি-৩৫ ফাইনালে ৩০.০১ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে ব্রোঞ্জ পদক জয় করে তাঁর দ্বিতীয় পদকটি পান প্রীতি। পুরুষদের শটপাট এফ-৩৭ ফাইনালে উঠেছেন ভারতীয় প্যারা-অ্যাথলিট মনু। পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল এসএইচ-১ ইভেন্টের ফাইনালে নেমেছিলেন বছর ২৩-এর মনীশ নারওয়াল। তাঁর সঙ্গে কোরিয়ান শুটারের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। এই ইভেন্টে রুপো জেতেন হরিয়ানার ফরিদাবাদের মনীশ। কোয়ালিফাইং রাউন্ডে ৫ নম্বরে শেষ করেছিলেন মনীশ। ফাইনালে শুরু থেকেই প্রথম পাঁচে ছিলেন ভারতীয় প্যারা-শুটার। একটা সময় এক নম্বরেও উঠেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শীর্ষস্থান ধরে রাখতে পারেননি। ২৩৪.৯ পয়েন্ট অর্জন করে রুপো জিতেছেন মনীশ। শুটিং থেকে প্যারা-গেমসে এটি ভারতের তৃতীয় পদক। এর আগে টোকিয়ো প্যারালিম্পিক্সে মিক্সড ৫০ মিটার এয়ার পিস্তলে সোনা জিতেছিলেন মনীশ। □

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩১

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

থাকছে

দেবী প্রসঙ্গ, উপন্যাস
জীবনী, পুরাণ কথা,
বড়ো গল্প, ছোট গল্প
প্রবন্ধ

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা